মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য এম. এ, বি. টি
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, ভাগীরথী কলেজ অব এডুকেশন, শিমুরালি
প্রাক্তন অধ্যাপক, কল্যাণী বি. টি. কলেজ

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

স্বর্গত মাতৃদেবীর
শ্রীচরণোদ্দেশে—

"—অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা ভাষার শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্য সম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

—রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

মাতৃভাষা মায়ের মুখ থেকে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেরা শিখে থাকে। তথাপি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সার্থক ব্যবহার তাদের শিখতে হয়, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদনও অনুশীলন করতে হয়, লিখন পঠনের সুষ্ঠু কৌশলটি আয়ত্ত করতে হয়।

এই শিক্ষাকার্যটি কত সহজে ও সুন্দরভাবে নির্বাহ করা যায় তাই দেখবার জন্য বহুকাল ধরে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তারই ফলে গড়ে উঠেছে বিস্তৃত মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি।

আমাদের দেশের শিক্ষক মহাশয়রাও শিক্ষাতত্ত্ব শিখতে এসে মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুশীলন করেন। তাঁদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থখানি রচনা করা গেল। সুতরাং সাধারণভাবে এটিকে মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি বললেও বিশেষভাবে গ্রন্থখানি বাঙালী ছেলেদের মাতৃভাষা শিক্ষণ-পদ্ধতি।

গ্রন্থখানিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পঠন-পদ্ধতি অংশ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয় অংশে আছে ছন্দ, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ। এদের মধ্যে ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা গেল। বাহুল্য বোধে ব্যাকরণ-আলোচনা বর্জন করা হয়েছে। যে কোন স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণেই প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে, গ্রন্থরচনায় আমার পূর্বসূরী স্বদেশীয় গ্রন্থকারগণের ঋণকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও নানাভাবে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতার ফলে গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ থেকে গিয়েছে। সেজন্য সুধীজনের কাজে ত্রুটী স্বীকার করি। পাঠকালে সেগুলি সহজেই সংশোধন করে নেওয়া চলতে পারে বলে তার স্বতন্ত্র শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত করলাম না।

গ্রন্থখানিতে কোনভাবে কেউ যদি কিছুমাত্র উপকার পান তাহলেই শ্রম সফল জ্ঞান করব।

'স্বাধীনতাদিবস' ১৯৫৯
কল্যাণী (নদীয়া)

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা		…	১— ৭
২। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক			৮—১২
৩। শব্দভাণ্ডার	…	…	১২—১৭
৪। সাধুভাষা ও চলতি ভাষা	…	…	১৭—২২
৫। গল্প বলা ও কবিতা পাঠ	…	…	২৩—২৮
৬। পঠন শিক্ষা	…	…	২৯—৩৩
৭। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান	…	…	৩৪—৩৮
৮। লিখন শিক্ষা	…	…	৩৯ – ৪২
৯। ব্যাকরণ শিক্ষা	…	…	৪৩—৪৬
১০। বানান সমস্যা	…	…	৪৬—৫৩
১১। রচনা শিক্ষা	…	…	৫৪—৫৭
১২। অনুবাদ শিক্ষা	…	…	৫৮—৬১
১৩। ছন্দ	…	…	৬২—৮৩
১৪। অলঙ্কার	…	…	৮৩—৯৬
১৫। পাঠটীকা—কি ও কেন ?	…	…	৯৭—১১৪
১৫ (ক)। শিক্ষাগত অভীক্ষা		…	১১৫—১২০
১৬। কবিতার পাঠটীকা	…	…	১২১—১২৪
১৭। গল্পের পাঠটীকা	…	…	১২৪—১২৯
১৮। ব্যাকরণ পাঠটীকা	…	…	১৩০—১৩৭
১৯। দ্রুতপঠন কাহিনীর পাঠটীকা	…	…	১৩৮—১৪০
২০। রচনার পাঠটীকা	…	…	১৪০—১৪২
২১। প্রশ্নাবলী	…	…	১৪৩—১৪৮

লেখকের অন্যান্য বই :

আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিশু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর মাতৃস্তন্য হতে অমৃত রসধারা গ্রহণ করে যেমন সে তার দেহ গঠন করে, মায়ের মুখ থেকে তেমনি ভাষা গ্রহণ করে তার ভাবসম্পদকে রূপ দেবার চেষ্টা করে।

মাতৃভাষাই মনের অস্ফুট ভাবগুলিকে সর্বপ্রথম পরিস্ফুট করে তুলতে শেখায়, অব্যক্ত প্রকাশ-বেদনাকে সার্থক অভিব্যক্তির স্তরে উন্নীত করে দেয়, অনির্দেশ্য ব্যাকুলতাকে নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়ে থাকে। আত্মিক জগতে, চিন্তার জগতে, ধ্যানের জগতে, মানসিক পরিমণ্ডলের জগতে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই মানুষ নবজন্ম লাভ করে, নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করে।

মাতৃগর্ভ থেকে শিশু যখন এই একান্ত অপরিচিত এক নূতন জগতে এসে প্রবেশ করে, তখন থেকেই তার সুরু হয় পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজন প্রচেষ্টা। অপরিচিত অজ্ঞাত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে চলে। তার ফলে শিশুর আত্মিক বিকাশ ঘটতে থাকে সামাজিক জীব হিসাবে।—এই আত্মবিকাশ তার ভাবে, ভাবনায়, চিন্তায় ও কর্মে। কিন্তু আত্মবিকাশের পদ্ধতিটি কি ?—

মাতৃভাষার উদ্দেশ্য

শিশুর বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আলোড়ন ঘটতে থাকে, তাকে স্পষ্ট করে রূপ দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের ভাষা।— এককথায়, মানুষের অন্তরের ভাবজগৎ আর বাইরের বস্তুজগৎ এই দুয়ের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হল তার ভাষা। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ পরস্পরকে নিকটে টানে— গড়ে তোলে পরিবার, সমাজ,রাষ্ট্র—কিন্তু এই গঠন কার্যের মৌল উপাদানই হল তার ভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা—যে ভাষা সে শিক্ষা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পায়নি, পেয়েছে মায়ের মুখ থেকে। আলো বাতাস জলের মতই একান্ত স্বাভাবিক ভাবে এবং অজ্ঞাতসারে এই ভাষা সে সংগ্রহ করেছে। এই মা শুধু গর্ভধারিণী জননীই নন, জন্মভূমিও বটে।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জগতের সমুদয় ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, একটা বিশেষ মূল্য আছে। জগতের মানুষ অসংখ্য, তেমনি তাদের মনের ভাব প্রকাশের কৌশলও সংখ্যাতীত। বিচিত্র জাতির বিচিত্র ভাষা। প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু সৌন্দর্য আছে, সাহিত্যও আছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাও হয়ত কিছু আছে, কিন্তু আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে মাতৃভাষার তুল্য আর কোন ভাষাই নয়।

মাতৃভাষার বিশেষ মূল্য

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল আত্মবিকাশ। বহুযুগের বহু মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে শিক্ষার মাধ্যমে। এই অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তার মানসিক সম্পদকে বাড়িয়ে তোলে, গতযুগের অভিজ্ঞতায় বর্তমান মানুষের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতম হয় এবং সেই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সে রেখে যায় আগামী দিনের জন্য—এমনি করেই হয় সভ্যতার অগ্রগতি।

কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে তা যেমন সুন্দর ও সার্থকভাবে করা যায়, এমন আর কোন ভাষাতেই নয়। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা।

তাছাড়া মাতৃভাষার আরো একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে—আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে। যে আত্মমর্যাদা বোধ, যে স্বাজাত্যবোধ, যে জাতীয় গরিমাবোধ আমাদের আত্মিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, সেই বোধটি আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাবোধের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কবির ভাষায় বলতে গেলে বাংলাভাষা বাঙালীদের কাছে শুধু মাত্র ভাবপ্রকাশের বাহনই নয়, সে হল "মোদের গরব মোদের আশা।"

কোন বাঙালীর জীবনে এই আশা ও গর্বের বিষয়টির মর্যাদা রক্ষিত না হলে অকল্যাণ শুধু সে হতভাগ্যেরই নয়, অকল্যাণ বাংলা দেশেরও।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি আলফঁস দোদের একটি বিখ্যাত গল্প—"দি লাষ্ট লেসন।"

শত্রু সৈন্য ফরাসীদেশ আক্রমণ করেছে। নগরের পর নগর তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। গ্রামের এক বিদ্যালয়ে শিশুদের পড়াচ্ছেন এক প্রবীণ শিক্ষক। দূরে শত্রু সৈন্যের কোলাহল। অবিলম্বেই দেশ তাদের করতলগত হয়ে যবে। প্রবীণ শিক্ষক বল্লেন—আর সময় নেই, দেশ পরাধীন হল বলে, আজ আমার শেষ শিক্ষা দিয়ে যাই। বলে যাব, ভুল না তোমাদের মাতৃভাষা, ভুল না মাতৃভাষার গৌরব।—তাহলে দেশ পরাধীন হলেও আবার সব ফিরবে। নইলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।......সৈন্য সামন্ত দিয়ে দেশের সংস্কৃতি বাঁচান যাবে না—সে বাঁচতে পারে যদি মাতৃভাষার মর্যাদা আমাদের অন্তরে চির-অম্লান থাকে—শিক্ষকের 'লাষ্ট লেসন' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর গুলিতে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে বহুকাল ধরে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন স্থান ছিল না। যে ভাষায় শিশু কথা বলে, চিন্তা করে অন্তরের অস্ফুট ভাবগুলিকে

স্ফুটতর করে তোলে, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বেলায় জ্ঞানার্জনের বেলায় তার কোন সাহায্যই শিশু পেত না; অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সে তা প্রকাশ করতে পারত না।

পরাধীন ভারতে মাতৃভাষার দুরবস্থা

পরাধীন দেশে বহুকাল ধরে ইংরাজীই ছিল বাঙালী ছেলের শিক্ষার বাহন। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ের পঠন পাঠনা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হত। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ খুঁজতে হয় এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাতায়।

পলাশীর প্রান্তরে বণিক ক্লাইভের কূটনৈতিক কৌশলে মানদণ্ড যে কেমন করে অকস্মাৎ রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেই লজ্জাকর কাহিনী আমাদের জানা আছে কিন্তু তার প্রায় শতবর্ষ পরে মেকলে সাহেবের কূটনৈতিক কৌশল দেশী খাগের কলম যে কেমন করে ধীরে ধীরে বিলাতি ষ্টিল পেনে পরিণত হয়ে গেল, সে কাহিনীও কম যুগান্তকারী নয়।

ক্লাইভের হাতে যে রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছিল মেকলের হাতে সাংস্কৃতিক পরাজয়ে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল। দূরদর্শী মেকলে সাহেব এই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যে নয়া কাঠামোটি রচনা করলেন, সামান্য অদলবদল করে অদ্যাবধি তাই চলে আসছে।

ইংরাজী শিক্ষার লাভ ও লোকসান

রাজকার্যের সুবিধার জন্যেই এককালে এদেশে ইংরাজী পঠন পাঠনার সূচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছাত্রেরা শিক্ষালয় থেকে বহুবিধ জ্ঞানার্জন করে ফিরবে এই শুধু লক্ষ্য ছিল না, পাকা ইংরাজীনবিশ হয়ে ইংরাজের রাজকর্ম পরিচালনায় সহায়তা করতে পারবে, সেইটেই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের লাভ হয়নি এমন কথা বলিনে। বাঙালী পৃথিবীর একটি বিশেষ উন্নত এবং সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে পৃথিবীর সারস্বত সম্মেলনে নিজেদের আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানভাণ্ডার সে অত্যল্পকালের মধ্যেই আত্মস্থ করে নেবার সুযোগ পেয়েছে। বাঙালী এই সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করে বিশ্বের দরবারে নিজেদের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং লাভ কিছু হয়নি এমন নয়, তবে সে লাভটা হচ্ছে লোকসানি কারবারের উপজাত (by-product) লাভ। এই প্রসঙ্গে লোকসানের

পরিমাপটাও চিন্তা করতে হয়। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সব কিছু শিখতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। অনেক শিশু বিদেশী ভাষা আয়ত্তিকরণের বৃথাশ্রমে গলদঘর্ম হয়ে জ্ঞানের অমৃতধারায় বঞ্চিত রয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষাও বড় কম উপেক্ষিত হয়নি। এর অপেক্ষাও আর একটা গুরুতর ক্ষতি হয়েছে—দেশবাসীর মধ্যে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, এদের মধ্যে একটি নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। মেকলের 'ফিলট্রেসন থিয়োরী' অর্থাৎ জ্ঞানের চুঁইয়ে পড়া নীতি ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের অপ্রবেশ্য শিলাস্তর ভেদ করে সার্থক হতে পারেনি। তাছাড়া ইংরাজীনবিশদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে সেখানেও একটা পাশ্চাত্য রীতি নীতির অন্ধ অনুকরণ-প্রীতির লজ্জাজনক অবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে।

পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী রাজপুরুষেরা আমাদের চিত্তভূমিতে যেভাবে বিজাতীয় মনোভাবের বীজ রোপন করে সাংস্কৃতিক বিজয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, ইংরাজী শিক্ষাকে অবলম্বন করে আজও তা আমাদের মধ্যে টিকে আছে। আজও আমরা অনেকেই দেশকে ভালবাসতে শিখিনি। দেশের রীতিনীতি দেশের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব আন্তরিক ভাবে স্বীকার করতে পারিনি।

স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে এই অবস্থা অবশ্যই গৌরবজনক নয়। তাই বলে ইংরাজী ভাষা, তথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা নেই, এমন কথা বলছিনে। তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ববিষয় জ্ঞান লাভের পর অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্যই বিদেশী ভাষার চর্চা করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করি—

"ছোট বেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মত হওয়া উচিত। খাদ্য দ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে,—তাহাতে তাঁহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরাজি শিক্ষায় এটি হইবার যো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে। মুখ বিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়।...প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়—"

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি অপরিণত, সামর্থ্য সামান্য, অভিজ্ঞতা অপূর্ণ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানসিক খাদ্য গ্রহণের দাঁতের গোড়ায় তেমন

জোর হয়নি, সুতরাং এই স্তর অবধি সর্ববিধ শিক্ষা একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই দিতে হবে, তবেই তা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক হবে। —এই একান্ত সাধারণ কথাটা অনেক বিচার বিতর্ক আন্দোলনের ফলে এবং মনীষী স্যার আশুতোষ ও শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় আমরা তা স্বীকার করে নিয়েছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন থেকেই মাধ্যমিক স্তরের সর্বপ্রকার পঠনপাঠনা মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন কি উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও আজ মাতৃভাষা কোথাও কোথাও আসন লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার দাবী

কিন্তু শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার অবাধ অধিকার আজও স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও মাতৃভাষার অধিকার অপেক্ষা অন্য কোন বিদেশী ভাষার অধিকার জোরালো হবে এমন কথা স্বীকার করা স্বাধীন দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমনটি ঘটেছে বলে নজির নেই।

রাশিয়ার এমন অনেক দেশ আছে কিছুকাল পূর্বেও যাদের ভাষার বর্ণমালা ছিল না—সেখানে আজ তারাও মাতৃভাষাতে সর্বপ্রকার জ্ঞানের স্বাদ পাবার অধিকারী হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও সমৃদ্ধতর হচ্ছে। আর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষা, বাংলাতে কেন তা সম্ভব হবে না একথা বোঝা শক্ত।

প্রতিপক্ষের কাছে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—উচ্চতম শিক্ষার উপযোগী, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ কোথায় বাংলা ভাষায়? সুতরাং বাধ্য হয়েই বিদেশী ভাষার শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। কিন্তু আপত্তিটি কি সত্যই খুব জোরালো?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি প্রণিধানযোগ্য—

"—কথা হইতে পারে বাংলায় এত বই কোথায়? তবে সেই কথাই হউক। বাংলায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা করা যাক। সিণ্ডিকেট সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন তবে দরিদ্র বাঙালী একাজে এখনই নিযুক্ত হয়। ম্যাকমিলান সাহেবকে অনেকদিন অন্ন যোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিতে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায়, ত তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞানবিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মতো সহজে সমাজের

আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থান বিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।—"

প্রায় ত্রিশ বৎসর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং স্বাধীন দেশের অধিবাসী হিসাবে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুধু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই নয়, আত্মমর্যাদা রক্ষার দিক দিয়েও আজ একান্ত অপরিহার্য।

এই দিক দিয়ে বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা-শিক্ষকেরও একটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিদ্যালয়ে পড়ান হয়— বাংলা ভাষাও পড়ান হয়। বাংলা ভাষার শিক্ষক সব সময়েই মনে রাখবেন তিনি কেবলমাত্র বাংলা ভাষা জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন না, তিনি স্বাধীন জাতির মাতৃভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মর্যাদা জ্ঞানও যদি তিনি ছাত্রদের না শেখাতে পারেন, তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে। ইংরাজ আমলে বাংলা শিক্ষকের নাম ছিল "ভার্ণাকুলার টিচার", মর্যাদায় তিনি ছিলেন ব্রাত্য। আমল পালটেছে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এখনো তেমন হয়েছে বলে দেখছিনে! বাংলা শিক্ষকের অমর্যাদা বাংলা ভাষারই অমর্যাদা, এবং ভাষার অমর্যাদা স্বাধীন জাতির সুষ্ঠ আত্মবিকাশের পরিপন্থী। এই কথাটি আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

বাংলা শিক্ষকের দায়িত্ব

ইংরাজের আমল থেকে এদেশে বাংলার নাম চলে আসছে ভার্ণাকুলার। ভার্ণাকুলার শব্দটা কুলীন জাতের নয়। এককালে এটাকে রোম্যানরা ইংলণ্ডে 'স্থানীয় দাসজাতির ভাষা' বোঝাতে চালিয়ে ছিল। আজ অবশ্য অর্থের পীনায়ন ঘটেছে 'মাতৃভাষা' রূপে। কিন্তু শব্দটির অন্তর্নিহিত অবজ্ঞার সুরটি ইংরাজরা ভুলেছিল বলে ত মনে হয় না।

যাই হোক, বাংলা ভাষা আজ আমাদের মাতৃভাষা হিসাবেই গ্রহণীয়, ভার্ণাকুলার হিসাবে নয়। দেহগঠন কার্যে বিলাতি টিনের দুধ যেমন মাতৃস্তন্য-সুধার স্থান গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি মনের গঠন কার্যেও পৃথিবীর কোন ভাষাই মাতৃভাষার স্থান পূরণ করতে পারে না। বিলাতিদুগ্ধনির্ভর শিশুর চেহারাটি প্রদর্শনীতে দেখবার যোগ্য হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তার আন্তরিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তে দেরী হয় না। বাঙালী এত শিখেও তাই এতদিনে জগতের কর্মশালায় নকলনবিশের পদ থেকে উন্নতি লাভ করতে পারল না।

তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করি—

"—কোন কোন ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না, ঢেঁকির কাঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারু রূপে ধান ভানিতে পারে কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এজন্য যে খুশি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে, সে কেন বিস্মিত হয়? মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে, তবেই ত মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত। কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া শেখা বুলি আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি জার্মানি যখন ফরাসি লিখিত তখন কি সে ফরাসী ভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল···ফ্রেঞ্চ এবং জার্মানিদের ভাষা ভাব দেশের প্রকৃতি ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে, আমাদের সহিত ইংরেজদের কি তাহার শতাংশও আছে? আমরা সেই ইংরেজি শিখিয়া সেই ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি অধ্যাপকের নিকট কি ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া ধিক্কার দাও কেন?"

সৌভাগ্যের বিষয়, আজ আমাদের কাঠের পা দূর করে দিয়ে নিজের পদগৌরবে নৃত্য করবার দিন এসেছে। এই নৃত্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই নয়, রাষ্ট্রীয় কার্যের ব্যাপক ক্ষেত্রেও আজ বেজে উঠেছে নৃত্যের বাদ্য।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সাহিত্যিক চর্চা কেন অতি প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে আলোচনা কর।

(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৫)

২। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? গত দশ বৎসরে এই গুরুত্ব বোধের পরিবর্তন হইয়াছে কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাইতে হইবে।

(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৭)

৩। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব কতখানি? শিক্ষা ও কর্মজীবনের কি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে বাংলা পড়াইবেন? (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৬১)

বাংলাভাষার উৎপত্তি ও সংস্কৃতের সঙ্গে তার সম্পর্ক

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের হাসিকান্না আনন্দ বেদনার অনুভূতিকে রূপ দিয়েছি, বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের অন্তর্জগতের যোগাযোগ স্থাপন করেছি, গদ্যপদ্যের অপরূপ সাহিত্য-রচনা করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গৌরবজনক আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং এই ভাষায় উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া আমাদের স্বাভাবিক।

বাংলায় সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দ অর্থাৎ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য দেখে অনেকে মনে করেন বাংলাভাষা হয়ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা সংস্কৃত থেকেই সোজাসুজি উৎপন্ন হয়েছে। কথাটা এক হিসাবে সত্য হলেও সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাবে এটি ঠিক নয়। যাই হোক একেবারে গোড়ার কথা থেকেই সুরু করি। নদীর উৎস সন্ধানে বের হয়ে যেমন ক্রমশঃ দুর্গম পার্বত্য উচ্চভূমিতে গিয়ে উপনীত হতে হয়, ভাষার উৎস সন্ধানে গিয়েও তেমনি সুপ্রাচীন কোন এক ইতিহাসপূর্ব যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুমাননির্ভর দুর্গম ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছুতে হয়।

আজ পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষী অসংখ্যজাতির বাস, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের গবেষণার পথ ধরে এগিয়ে চললে দেখা যাবে এক একটি মৌলিক ভাষা থেকে স্থানকাল ভেদে অনেকগুলি ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

ভারতীয় ভাষার আদিকথা

পৃথিবীর এমনি একটি মৌলিক ভাষার অস্তিত্ব অনুমান করেন পণ্ডিতেরা ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতিদের ভাষা। এই জাতির বাসস্থান সম্ভবত ছিল ইউরেশীয়া ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে কোন এক অঞ্চলে (অবশ্য এই বাসস্থান নির্ণয় নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে)। এই জাতিই হল প্রাচীন আর্য জাতি।

তারপর জনসংখ্যাবৃদ্ধি-জনিত খাদ্যাভাবের ফলেই হোক বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই হোক আর্যেরা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর চারিদিকে—কালক্রমে স্থানকালপাত্র ভেদে তাদের মুখের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গেল—সৃষ্টি হল নূতন নূতন ভাষা। পণ্ডিতেরা এদের মোটামুটি দশটি ভাগে ভাগ করেন—কেলটিক্, গ্রীক, ইটালীয়, জার্মানীয়, তুখারীয়, হিট্টাইট, আর্মেনীয়, আলবেনীয়, শ্লাভীয় এবং ইন্দোইরানীয়।

এদের মধ্যে ইরাণে উপনিবেশকারী আর্যদের ভাষা ইন্দোইরানীয় থেকেই ভারতীয়-আর্য-ভাষার জন্ম। পরবর্তী এক যুগে একদল আর্য ইরাণ থেকে ক্রমশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এসে উপস্থিত হল। কালক্রমে এদের মুখের ভাষা যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছিল, তারই সাহিত্যকরূপের পরিচয় আমরা পাই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। ক্রমশ আর্যগণ যখন ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন এই বিশাল ভূখণ্ডে তাদের পূর্বতনভাষা আর অবিকৃত রাখা সম্ভব হল না। তার উপর স্থানীয় অনার্যগণও এই ভাষা গ্রহণ করাতে ভাষার উপর তাদের উচ্চারণ রীতির প্রভাবও পড়েছিল কম নয়।

এই ভাবের প্রাকৃতজনের প্রভাবান্বিত বিকৃত আর্যভাষাই হল প্রাকৃত ভাষা।

ভাষাতত্ত্বে এই ভাষার নাম হল—মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য-ভাষা—এর ব্যাপ্তি খৃঃ পূঃ ৬০০ বছর থেকে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত। সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে আমরা সংস্কৃতভাষার পরিচয় পাই তাও এই প্রাকৃত যুগেই উৎপন্ন হয়েছিল। এই সংস্কৃত কোনদিনই আর্যদের মৌখিক ভাষা ছিল না—এটা একটা কৃত্রিম লেখ্য ভাষা।

সংস্কৃত ও বাংলার সম্পর্ক

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্যেতর জাতির প্রভাবে বৈদিকভাষায় দ্রুত বিকৃতি ঘটছিল দেখে শিষ্ট জনের জন্য একটা বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন অনেকে। তার ফলে ব্যাকরণে সূত্রাদি নির্মাণপূর্বক তাকে সংস্কার করে একটি নতুন ভাষা তৈয়ারী করা হয়—তাই তার নাম সংস্কৃত। এই ভাষা-সংস্কার কার্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হল তক্ষশীলাবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত পাণিনির।

যাইহোক শিষ্টজনের লেখ্যভাষায় সংস্কৃতের ব্যবহার চলল বটে কিন্তু জনসাধারণের মুখে মুখে চলল তার একটা বিকৃত রূপ—প্রাকৃতজনের উচ্চারণবৈকল্যের ফলে এর উৎপত্তি বলে এই জাতীয় ভাষার নাম দেওয়া হল প্রাকৃত।

অবশ্য সংস্কৃতের যেমন একটা সর্বভারতীয় রূপ অবিকৃত আছে, প্রাকৃতের তা নেই এবং তা থাকা সম্ভবও নয়। ভারতবর্ষ বিশাল ভূখণ্ড। এর বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটল। এইসব ভাষার স্থিতিকাল হল একশো থেকে পাঁচশো' খৃষ্টাব্দ—আর এদের নাম হল অঞ্চলভেদে শৌরশেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী, এবং অর্ধমাগধী—এই ভাবে প্রাকৃতভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করল। তবে এই ভাষাও বেশীদিন নিজ স্বরূপ অবিকৃত রাখতে পারেনি। আর্যেতর জাতির ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণে প্রাকৃত ভাষায়ও অনেক পরিবর্তন ঘটতে লাগল। এই পরিবর্তিত প্রাকৃত

ভাষার নাম অপভ্রংশ। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন অপভ্রংশের রূপও হল বিভিন্ন। এবং সেইসব বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই ভারতের বর্তমান প্রাদেশিক ভাষা সমূহের জন্ম হয়েছে।

মগধ (বিহার অঞ্চলে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

এ প্রায় হাজার বছর পূর্বের ঘটনা—মূল সংস্কৃত থেকে পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর বেয়ে কি ভাবে বর্তমান বাংলাভাষা উৎপন্ন হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	বর্তমান বাংলা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	সাঁঝ	সাঁজ
গ্রাম	গাম	গাঁব	গাঁও	গাঁ
ইন্দ্রাগার	ইন্দ্রাআর	ইন্দার	ইন্দারা	ইন্দারা
কৃষ্ণ	কন্হ	কনহ	কাহ্ন	কানাই
ভবতি	হোতি	হোই	হোই	হয়

বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদাবলী নামক নেপাল থেকে আনীত প্রায় হাজার বছরের পুরোণো একখানি পুঁথিতে। চর্যাপদের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা খুবই কম। পরবর্তীযুগে বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময়ে বাংলা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করতে থাকে। তারপর মুসলমানগণ এদেশে আসার পর এই ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এসে জোটে। অবশেষে পর্তুগীজ ফরাসী ও ইংরেজেরা আসার ফলে প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ ও বাংলা শব্দ ভাষায় এসে জমতে লাগল। ওদের মধ্যে ইংরাজরা আবার সুদীর্ঘ দেড়শ বছর ধরে এই দেশে রাজত্ব করে গিয়েছে—তার ফলে শুধু ইংরাজী শব্দই নয়, ইংরাজী ভাষারীতি, বাক্যগঠন প্রণালী, ছেদ বিন্যাস প্রভৃতি অনেক কিছুই এসে গিয়েছে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে। সুতরাং ভাষার শব্দভাণ্ডার আলোচনা করলেই ভাষার ক্রমবিকাশের ধারাটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং চলে গিয়েছে। তাদের সবারই পদচিহ্ন রয়ে গিয়েছে বাঙলার শব্দভাণ্ডারে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

মোট কথা, বাংলাভাষা সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি উৎপন্ন হয়নি বটে কিন্তু সংস্কৃত উৎস থেকেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে বললে ভুল বলা হবে না। সংস্কৃতকে বাংলাভাষার জননী বলা না গেলেও পিতামহীস্থানীয়া অবশ্যই আমরা মনে করতে পারি। মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলাভাষার দেহ গঠন হয়েছে বটে কিন্তু দেহসৌষ্ঠব

ঘটেছে পিতামহীর রত্নপেটিকা থেকে পাওয়া অপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত শব্দ অলঙ্কারের দ্বারা। তাছাড়া প্রাণধর্মের দিক দিয়েও সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী।

সুতরাং বাংলাভাষা পঠনপাঠনা করতে গেলে সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য।

বাংলার ছাত্রদের সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাভাষাকে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষারূপে গ্রহণ করবার চেষ্টা যতই হোক, ভাব প্রাণশক্তিটি কিন্তু নিহিত আছে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে। তাই বাংলাভাষার জ্ঞানটি সুসম্পূর্ণ করতে হলে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যথোচিত থাকা চাই।

বাংলার ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা দু'দিক দিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি- এক, ভাষার দিক. অপর, ভাবের দিক।

প্রথমতঃ ভাষার দিক থেকে বলা যায় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান বাংলা শব্দার্থবোধ ও মর্মগ্রহণে সাহায্য করে, বাংলার শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ গঠন করবার ক্ষমতা সংস্কৃতের অপরিসীম- সেই নবগঠিত শব্দ সম্ভার বাংলার শব্দভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করছে—সংস্কৃতের জ্ঞান না থাকলে এই ভাবে শব্দ গঠন করবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিভাষা সংকলনে সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য। নূতন নূতন শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধি বিধান অনুযায়ী নির্মাণ করেই পরিভাষা তৈয়ারী করা হচ্ছে। সংস্কৃতের সঙ্গে যোগসূত্র কেটে দিলে বাংলায় কি করে তা সম্ভব হবে ?

তৃতীয়তঃ—বাংলা ব্যাকরণ এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক বিধি বিধান—যথা সন্ধি, সমাস, বিভক্তি, কারক, প্রভৃতি বাংলা-ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সংস্কৃতভাষাজ্ঞানটি ভালভাবে থাকলে তবেই বাংলাভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ আমরা আশা করতে পারি। তৎসম শব্দের বর্ণাশুদ্ধিও একমাত্র ভাষাজ্ঞানের দ্বারাই দূরীভূত করা যায়।

মোট কথা, বাংলায় শব্দভাণ্ডার শব্দগঠনরীতি, প্রয়োগ কৌশল, ভাষা ব্যবহারের আঙ্গিক প্রকরণ সবই সংস্কৃতানুগ—সুতরাং বাংলাভাষার ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয় কথা ভাবের দিক—জাতিগত হিসাবে আমরা বাঙালীরা ভারতীয়, আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী। সভ্যতার যাবতীয় চিন্তাধারার পরিচয় একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির যে নিদর্শন তার কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় পেতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য।

এককথায়, প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির সঙ্গে আজও যে আমরা নিজেদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছি সেই সূত্রটি হল সংস্কৃত ভাষা।

সুতরাং ভাবের দিক থেকেও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্কটি বুঝাইয়া দাও। বাংলা পড়িতে ও পড়াইতে সংস্কৃতের জ্ঞান কতখানি সহায়তা করে? (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫৪)

২। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বিবৃত কর।

শব্দভাণ্ডার

ভাষার প্রধান সম্পদ হল তার শব্দ; শব্দের ভাণ্ডার যার যত সমৃদ্ধ সে ভাষাও মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের তত উপযোগী। সভ্যতার পথে আমরা যত এগিয়ে এসেছি ততই আমাদের মননশক্তি বেড়েছে, মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা বেড়েছে। তার ফলে একদিকে যখন নূতন নূতন শব্দ গঠন করেছি, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ভাষা থেকে কত বিচিত্র শব্দ আত্মসাৎ করে আমরা আমাদের শব্দের ভাণ্ডার স্ফীত করে তুলেছি। বাংলা ভাষার শব্দ সংখ্যা আজ প্রায় সোয়া লক্ষ।

শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করবার উপায় দুটি—এক হল ধাতুতে বা শব্দে প্রত্যয় যোগ করে নূতন নূতন শব্দ গঠন করা এবং অপরটি হল সোজাসুজি অপর ভাষা থেকে শব্দকে আত্মসাৎ করে নিজের করে নেওয়া। প্রথম পন্থায় অগ্রণী হল সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষা আর বিদেশী ভাষা আত্মসাৎ করায় ইংরাজী ভাষার জুড়ি নেই। উভয় উৎস থেকেই শব্দ গ্রহণ করে বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে—বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এসে প্রচুর নূতন নূতন বিদেশী শব্দ জুটেছে সেখানে।

বাঙালী জাতি যখনই অন্য ভাষাভাষী বিদেশী জাতির সঙ্গে মিলেছে, তখনই উভয়ের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক মিলন স্থাপিত হয়েছে এবং তার ফলে তাদের বহু শব্দ বাংলা শব্দ-কোষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সুতরাং এই দিক দিয়ে বাংলা শব্দপুঞ্জকে মোটামুটি দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে,—মৌলিক আর আগন্তুক।

(১) **মৌলিক :**—মৌলিক শব্দ হচ্ছে বাংলা ভাষার নিজস্ব উপাদান। সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তরের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষা প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত থেকেই উৎপন্ন। তাই সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ শব্দগুলিই হল বাংলা ভাষার মৌলিক শব্দ। এই মৌলিক শব্দগুলিকে আবার উৎপত্তির স্তর হিসাবে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব, এই কয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এ ছাড়া রয়েছে দেশী শব্দ। আর্যেতর জাতির ভাষা থেকে যেগুলি বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে দেশী শব্দ বলা হয়। এগুলি বাংলা দেশবাসীর নিজস্ব শব্দ হলেও সংস্কৃতের ধারা বয়ে আসেনি বলে এগুলিকে বাংলার মৌলিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করে আগন্তুক বলেই ধরা হয়।

সুতরাং প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দপুঞ্জকে প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যথা **মৌলিক শব্দ**—তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব, এবং আগন্তুক শব্দ—**দেশী ও বিদেশী**।

তৎসম

(ক) **তৎসম** শব্দের অর্থ হল তৎ=তাহা (সংস্কৃত) সম=সমান, অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ, যথা বৃক্ষ, পৃথিবী জল, ফল, কৃষ্ণ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি—উচ্চারণ যাই হোক, বানানে এগুলি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ। বাংলা সাধুভাষাতে শতকরা প্রায় ৪৫টি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অর্ধ তৎসম

(খ) অনেক তৎসম সংস্কৃত শব্দ বাঙালীর জিহ্বায় স্বরভক্তি বা স্বরসঙ্গতির প্রভাবে কিছু কিছু বিকৃত হয়ে পড়েছে। এই বিকৃত তৎসম শব্দকে বলা হয় অর্ধতৎসম শব্দ। বাংলায় আগত বহু সংস্কৃত শব্দ এই ভাবে অর্ধতৎসম শব্দে পরিণত হয়েছে। যথা—নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, কৃষ্ণ>কেষ্ট, পুরোহিত>পুরুত, চন্দ্র>চন্দর, সূর্য>সুয্যি, জ্যোৎস্না>জোছনা, মহার্ঘ>মাগ্‌গি, মহোৎসব>মচ্ছব ইত্যাদি।

তদ্ভব

(গ) **তদ্ভব** বা তৎ-ভব অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে জাত। যে সব শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের স্তর বেয়ে কিছু পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে এসে সঞ্চিত হয়েছে, তাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ। এই তদ্ভব শব্দই হল বাংলা ভাষার প্রধান সম্পদ। বাংলায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০টি শব্দই হল তদ্ভব। যথা—

কার্য>কজ্জ>কাজ, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, খাদ্য>খজ্জ>খাজা, ইন্দ্রগার >ইন্দাআর>ইঁদারা, কৃষ্ণ>কন্হ>কানু, ষোড়শ>ষোলহ>ষোল ইত্যাদি। এছাড়া বাংলায় এমন আরো কতকগুলি তদ্ভব শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মূল সংস্কৃত নয়। কিন্তু সংস্কৃতের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃত অপভ্রংশের স্তর বেয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। এ শব্দগুলি থেকে প্রমাণ হয় বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করতে সংস্কৃত ভাষাও এককালে কম পটু ছিল না। এই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত ভাণ্ডারে বিদেশী বা আগন্তুক পর্যায়ের কিন্তু আমরা সংস্কৃতের মারফতে পেয়েছি বলে এদের মৌলিক পর্যায়ে ধরা হল। যথা—

(তামিল) মুট্টৈ—(সং) মুকুট—মুডঅ—মোট

(গ্রীক) দ্রাখ্মে—(সং) দ্রম্য—দম্মে—দাম

(পহলবী) পোস্ত—(সং)—পুস্তিকা—পুত্থিআ—পুথি

(তুর্কী) তিগির—(সং) ঠক্কুর—ঠাকুর ইত্যাদি।

২। **আগন্তুক :—**

(ক) দেশী—প্রাচীনকালে আর্যেরা যখন আর্য ভাষা নিয়ে এদেশে এলেন তখনও এদেশে আর্যেতর একটা জাতি ছিল এবং তাদের ভাষাও ছিল। বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফলে, মেলামেশার ফলে এই আর্যেতর জাতির অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে কিছু দেশী ভাষার শব্দও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও একেবারে নগণ্য নয়। যথা ঢেঁকি, ডিঙ্গি, ঝাঁটা ঝিঙে, তেঁতুল, চাউল, ডাঙ্গা, ঢোল, ডাঁসা, ডাব ইত্যাদি। এই শব্দগুলি অজ্ঞাতমূল অর্থাৎ কোন ধাতু থেকে উৎপন্ন বা কোন প্রত্যয় যোগে গঠিত তা আজ আর বলা সম্ভব নয়।

দেশী

(খ) বিদেশী :—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারে বিদেশী শব্দের আমদানী বড় কম হয়নি।

১৩ শতকের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ বিদেশী মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে, তারপর ১৬ শতকে অর্থাৎ মোগল যুগে বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য ও শাসনকার্যে মোগল সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে ওঠে, তার ফলে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে পার্শীভাষার প্রভাব পড়ে যথেষ্ট। এই প্রভাব উনিশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরাজ যুগের প্রথম আমল পর্যন্ত অব্যাহত ভাবেই বেড়ে চলেছিল।

বাংলায় শব্দভাণ্ডারে পার্শী শব্দের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

পার্শীভাষায় বেশ কিছু আরবী শব্দও আছে, তুর্কী শব্দও আছে। পার্শী মারফৎ সেগুলিও বেমালুম বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে আপনার স্থান করে নিয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে সামান্য কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করি—

পার্শী—মালিক, শিকার, খাজনা, আবাদ, দারোগা, আসামী, ইয়ার, কামান, কারিগর, উকিল, নালিশ, আয়না, দোয়াত, খাতা, চশমা, জমিদার, জায়গা, তাজা, দোকান, বাগান, ময়দা, ময়দান, রসদ, রাস্তা, চরখা, শিশি—ইত্যাদি

আরবী—আইন আদালত, আক্কেল, কেচ্ছা, খবর, খাবার, খাসি, গরজ, ফৌজ, মালিক, হুজুর, আতর, তাজ্জব, বিদায়, কেতাব, কলম—ইত্যাদি।

তুর্কী—আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কুলি, চাকু, বোঁচকা, লাস, চকমকি, ঠাকুর ইত্যাদি।

পোর্তুগীজরা ষোল শতকে বাংলায় আসতে সুরু করে। তারাও কিছু শব্দ বাংলার ভাণ্ডারে জমা দিয়ে গিয়েছে।

যথা—আনারস, আতা, তামাক, চাবি, তোয়ালে, বালতি, কেদারা, কামরা গুদাম, পেঁপে, কপি, বোতল, পেরেক, ফিতা, সাবান -ইত্যাদি।

ইংরাজী—আঠার শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ইংরেজের অধীন হল। তারপর থেকে শিক্ষাদীক্ষায় সামাজিক আচার আচরণে, শাসনব্যবস্থায় ইংরাজী সভ্যতার প্রভাব কেমন ব্যাপকভাবে যে বাংলার জাতীয় জীবনকে আচ্ছাদিত করে চলেছে তার পরিচয় আজ কারো অজানা নেই। অসংখ্য ইংরাজী শব্দ আমরা ভাণ্ডারজাত করে ফেলেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ অল্প কয়েকটি শব্দ এখানে উল্লেখ করি—উল, উইল, কালেক্টর, কমিটি, কলেরা, গেট, গ্লাস, চেয়ার,, টেবিল, টিন, ডিস, ডাক্তার, নম্বর, নোট, নিব, পিন, পকেট, কোট, প্যাণ্ট, পেন্সিল, পাশ, ফেল, মাষ্টার, মাইল, মিনিট, টিকিট ইত্যাদি।

আবার অনেকক্ষেত্রে মূল ইংরাজী শব্দের তদ্ভবরূপ বাংলা শব্দের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে তাদের হঠাৎ চেনাই দায়, যেমন—

লাট (Lord),লণ্ঠন (Lantern) গেলাস (Glass) আস্তাবল (Stable) হাসপাতাল (Hospital) গারদ (Guard) সান্ত্রী (Sentry ইত্যাদি—

অনেক ইংরাজী শব্দ আবার বাংলা ভাষার উপসর্গের কাজ করে। যেমন—ফুল (ফুলমোজা · ফুলহাতা) হাফ (হাফ কাপ্তান, হাফপ্যাণ্ট) হেড (হেডপণ্ডিত, হেড

মিস্ত্রী) ইত্যাদি। দীর্ঘ দেড়শত বৎসরের সাহচর্যে শুধু যে ইংরাজী শব্দই আমরা পেয়েছি তা নয়, ইংরাজী চিন্তাধারাও আমরা কম পাইনি, তার ফলে আমাদের বাক্য গঠন রীতিতেও ইংরাজী প্রভাব পড়েছে প্রচুর—

Golden opportunity বলিতে সুবর্ণসুযোগ, obliged বলতে বাধিত, Lions share—বলতে সিংহভাগ—এসব আজ হামেসাই দেখা যাচ্ছে।

অন্যান্য বিদেশী শব্দের মধ্যে—

ওলন্দাজ—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ, ইসক্রুপ ইত্যাদি।

ফরাসী—কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ, ফিরিঙ্গী ইত্যাদি।

চীনা—লিচু, চা, তুফান, চিনি, সিন্দুর।

জাপানী—রিকসা, যুযুৎসু, হাসনুহানা।

বর্মী—লুঙ্গি, ফুঙ্গি।

মালয়ী—গুদাম, সাগু।

এছাড়া ভারতীয় অন্যান্য আর্যভাষাগুলি থেকেও বাংলায় অনেক শব্দ আমদানী হয়েছে। যথা—

হিন্দুস্থানী—বাণী (বানাবার মূল্য), পুরি, কচুরি, ঝুটা।

পাঞ্জাবী—চাহিদা, শিখ।

গুজরাটী—হরতাল, খদ্দর ইত্যাদি।

এছাড়া একজাতীয় শব্দের সঙ্গে অপর জাতীয় শব্দের মিশ্রণে একপ্রকার সঙ্কর শব্দ বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন—

হাটবাজার = হাট (তদ্ভব) + বাজার (পার্শী)

মাষ্টার মশাই = মাষ্টার (ইংরাজী) + মশাই (অর্ধতৎসম)

ডেপুটিগিরি = ডেপুটি (ইংরেজি) + গিরি (পার্শী প্রত্যয়)

রাজাউজির = রাজা (তৎসম) + উজির (পার্শী)

বেটাইম = বে (পার্শী উপসর্গ) + টাইম (ইংরাজি)

হেডপণ্ডিত = হেড (ইংরাজি) + পণ্ডিত (সংস্কৃত)

হাফ হাতা = হাফ (ইংরাজি) + হাতা (তৎভব) ইত্যাদি।

এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন শব্দ এসে বাংলার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এইভাবে বাংলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতমা হয়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

১। যে যে শ্রেণীর শব্দ লইয়া বাংলা শব্দভাণ্ডার গঠিত, উদাহরণ সহকারে তাহাদের পরিচয় বিবৃত কর—। আদর্শ বাংলা চলিত ও সাধুভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের প্রয়োগে কোনও অনুপাত রক্ষা করিয়া করিয়া চলা সম্ভব কি ? (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৩)

২। বাংলাভাষার শব্দ ভাণ্ডারে কয়শ্রেণীর শব্দ পাওয়া যায় ? প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি উদাহরণ দিয়া ভাষার বিকাশে শ্রেণী কয়টির স্থান নির্দেশ কর ? (ক. বিঃ—বি. টি. ১৯৬১)

সাধুভাষা ও চলতি ভাষা

প্রত্যেক দেশেই ভাষার দুটো রূপ—একটা বাচননির্ভর এবং আর একটা লিখন-নির্ভর। বাচননির্ভর ভাষার স্থান কাল কেবল বর্তমানের বেখায় সীমিত, বক্তার সম্মুখস্থ উপস্থিত ব্যক্তি মাত্র তার উদ্দীষ্ট।—কিন্তু লিখননির্ভর রচনার ব্যাপ্তি আরো অনেক বেশী। অনুপস্থিত ব্যক্তি ও অনাগত কালকে সম্মুখে রেখে সেই রচনার সৃষ্টি। সুতরাং সেই দুই জাতের ভাষার পার্থক্য অনিবার্য।

মুখের ভাষা বদলে যায় একস্থান থেকে আর একস্থানে—সামান্য ৫।৬০ মাইল তফাতেই। ...এই হিসাবে বাংলাদেশে বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যেই যে কত মুখের ভাষা বা 'ডায়ালেক্ট' প্রচলিত আছে তার আর ঠিক নেই। ভাষা তত্ত্ববিদেরা এইসব ডায়ালেক্টকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, বাঙ্গালী বা পূর্ববঙ্গ, বরেন্দ্রভূম বা উত্তরবঙ্গ, ঝাড়খণ্ডী বা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ এবং কামরূপ বা উত্তর-পূর্ববঙ্গ এই পাঁচ অঞ্চলের বাক্য-প্রয়োগ ধারাকে বাংলার পাঁচটি প্রধান ডায়ালেক্ট বলে ধরা হয়েছে।

এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলে অপ্রচলিত, হয়ত বা অবোধ্যও। তাই লেখ্যভাষায় সর্বজনবোধ্য অর্থাৎ সমস্ত বাঙালী বুঝতে পারে এমন একটা রূপ দিতে হয়—যে রূপটি কোন নির্দিষ্ট স্থানের নয়। —সেই হল সাধুভাষা।

ভাষার এই সর্বজনবোধ্য মার্জিত এবং সৌন্দর্যশালী রূপই হল লিখিত ভাষার রূপ।

মুখের কথায় আমাদের দৈনন্দিন জৈব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় আর লেখার কথায়

আমাদের সৌন্দর্য পিপাসু মন সাহিত্যসৃষ্টি করে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বির দিকে তাকিয়ে।

এই ত হল সাধু আর চলতি ভাষার সূচনার কথা। উৎপত্তির কথা বাংলার এই দুটি ধারার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে এ'দুইটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। যোল শতকের মাঝামাঝি লেখা একটি পত্রের অংশ উধৃত করি—

"তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। তখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে—"...রচনার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার তখনও খুব বেশী হয় নি। তারপর সাহিত্যের ভাষায় ক্রমে ক্রমে যত সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করতে লাগল ততই দুই ভাষার রীতির মধ্যে প্রভেদ লাগল বাড়তে।

অবশ্য লিখিত রূপের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। প্রচীনকালে (১৮ শতক-অবধি) বাংলাভাষার সাহিত্য সবই প্রায় কবিতায় রচিত হত। গদ্যের কোন স্থানই ছিলনা বলা যেতে পারে। ১৮ শতকের শেষভাগে বা ১৯ শতকের প্রথম ভাগে যখন থেকে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হতে সুরু হল, লেখাপড়ার কাজে গদ্যের প্রচলন হল, সেইদিন থেকে লেখ্যরূপের ইতিহাস সুরু।

এই প্রসঙ্গে বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাস আলোচনা করবার প্রয়োজন নাই, তবে সংক্ষেপে এইটুকু শুধু উল্লেখ করতে পারি যে, সেদিন গদ্যের জন্মটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টির স্বাভাবিক আবেগে তা মানুষের হৃদয় থেকে আপনি উৎসারিত হয়নি—হলে সে ভাষা হয়ত এতটা কৃত্রিম হত না। উনিশ

সাধু ভাষা

শতকের গোড়ায় সাহেবদের বাংলা শেখানর জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন হল এবং এই কাজের ভার পড়ল পণ্ডিতদের উপর। পণ্ডিত মানেই সংস্কৃত পণ্ডিত,—যে গুণে তাঁদের খাতির, সেই গুণের প্রতি তাঁরা যথেষ্টই অবহিত। সুতরাং বাংলা গদ্যের ভাষা সংস্কৃত সন্ধি সমাস এবং অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ সম্ভারে ভরে উঠল। দৃষ্টান্ত দিই—

...যদ্যপি অন্যোন্যে বাধ্যবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরস্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থের প্রয়োজন বিশেষে সমবায়ে তৈলবর্তিশিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির ন্যায় অর্থসিদ্ধি হইতে পারে।—

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)

বলাই বাহুল্য মুখে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে এর ব্যবধান হয়ে উঠল দুস্তর। এই প্রথমপ্রসূত বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতের কনিষ্ঠ সহোদরা বলে চিনে নিতে কারো কষ্ট

হয় না। অন্যের কথা বাদ দিলেও বাংলা গদ্যসৃষ্টির কার্যে বিশ্রুতকীর্তি বিদ্যাসাগর মশাইও প্রথম দিকে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তার একটু নমুনা দিচ্ছি—
—উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল ফেনানিচয় চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি নক্র-চক্র ভীষণ-স্রোতস্বতী-পতি-প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল—

এই ছিল তখনকার গদ্য লেখার অবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে সখেদে বলেছেন—'লোকে বুঝুক না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি'—"

এইবার চলতি ভাষার অবস্থা বলি। আগেই বলেছি চলতি ভাষা হল মুখের ভাষা—সুতরাং স্থান ভেদে প্রচুর ভেদ। তাহলে সাহিত্য রচনায় কার দাবী অধিক বলে মানা হবে? লেখকেরা আপন আপন জেলার ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করলে তো মহা বিভ্রাট বাধবে। কে কার লেখা পড়ে বুঝতে পারবে? কোনও একটি বিশেষ ডায়ালেক্ট ধরে যদি লিখতে হয় তবে সেটি কোন অঞ্চলের ডায়ালেক্ট—যেটি সবাই মানবে সাহিত্যের ভাষা বলে?

চলতি ভাষা

এর উত্তরে বলা যায় সাংস্কৃতিক প্রাধান্যেই ভাষার প্রাধান্য এনে দেয় সকল দেশেই। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীই আর্য সংস্কারের মেরুমজ্জা। "ভাগীরথী উভকূল, বারাণসী সমতুল"—এই প্রবাদ বাক্যে ভাগীরথী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব যে সারা বাংলায় স্বীকৃত, তারি প্রতিধ্বনি। তাছাড়া নবদ্বীপ সুপ্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল—সুতরাং এই অঞ্চলের ভাষা বিদগ্ধজনের ভাষা বলেই সারা বাংলায় বহুকাল ধরেই আদৃত! তারপর কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতিই হল বাংলার আদর্শ সংস্কৃতি, অনুকরণীয় সংস্কৃতি। তাই 'নদে শান্তিপুরের ভাষা'ই তখন শিষ্ট ভাষা, মিষ্টি ভাষা বলে গৃহীত। তারপর ইংরাজ যুগে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি আরো একটু দক্ষিণে সরে নব রাজধানী কলকাতায় চলে এলো। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপুল আকর্ষণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিতজন এই কলকাতায় এসে পড়লেন। ফলে কলকাতায় চলতি ভাষার একটা সর্বজনীন আবেদন তৈরী হয়ে উঠল। এই চলতি ভাষার সাহিত্যোপযোগিতার প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। বঙ্কিমচন্দ্র ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—"এতদিনে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল, বাংলা সাহিত্যের মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল—"

কোন অঞ্চলের কথিত ভাষা আদর্শ?

এই যুগান্তকারী গ্রন্থের একটু নমুনা উদ্ধৃত করি "—শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, তাহা হইলে সেই সকল সদ্ভাব ক্রমেই পেকে উঠতে পারে, তখন কুকর্মে মন না দিয়া সৎকর্মের প্রতি ইচ্ছা প্রবল হয়; কিন্তু বাল্যকালে কুসঙ্গ অথবা অসদুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলতা হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা—"

অবশ্য "আলালের ঘরের দুলাল" যে খুব সার্থক সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। ভাষার মধ্যে সাধু, চলিত ও গ্রাম্য সব রকমের শব্দই মিশ্রিত হয়েছে—তা'সত্ত্বেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অনেক।

সাধুভাষার কঠোর বন্ধন শিথিল করে বাঙালী ভাষা অনেকখানি এগিয়ে এল চলতি ভাষার দিকে। এরপর আরো খানিকটা এগিয়ে এল কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা।" হুতোমে মৌখিক ক্রিয়াপদের অজস্রতা উল্লেখযোগ্য। যথা—

"প্রলয় গর্মিতে একদিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাডাচ্চি এমন সময় পদে অংগলের মুহুরা বল্লে—"

এর পর থেকে কলকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষায় প্রচুর সাহিত্য রচিত হতে লাগল। প্রথম প্রথম পণ্ডিতদের কাছ থেকে বাধা বড় কম আসেনি, কিন্তু এই নবভাষা তার প্রাণধর্মের প্রাচুর্যে সমস্ত বাধা বিপত্তি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এইখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লিখিত ভাষার যে আদিরূপের উল্লেখ করেছি সেইখানেই সে যে দাঁড়িয়ে ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। তার সংস্কৃত ভগ্নীর হাত ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সে উপস্থিত হয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় দুয়ারে। বাংলা গদ্যের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের লিখিত রূপও স্বচ্ছন্দ সাবলীল হয়ে উঠল এ'ত বলাই বাহুল্য। চলতি ভাষার তুলনায় এর প্রধান বৈশিষ্ট্য তৎসম-তৎসম শব্দের প্রাধান্য এবং ক্রিয়া সর্বনামের সাধু রূপ।

পরে কথা-শিল্পী লেখক বৃন্দের হাতে এসে এই লেখ্য ভাষাও অনেকটা অগ্রসর হয়ে এল মুখের ভাষার কাছে। রচনার মধ্যে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী শব্দ নির্বিচারে ব্যবহার করে ভাষায় মিষ্টত্ব আনবার চেষ্টা চলতে লাগল। সাধু ভাষার এই ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি নমুনা দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে—

সাধুভাষার রূপান্তর

(১) বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) বাঁশের নলটি তাহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে

খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটি ক্রয় করেন। (সঞ্জীবচন্দ্র)

(৩) অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার মন বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। (শরৎচন্দ্র)

(৪) সন্ধ্যা হইয়াছে! মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভর্তি হইয়া গিয়াছে, বাগানের বেল গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপর জাগিয়া আছে, বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ)

এরপর কথ্য-ভাষার উন্নয়নে আর একজন বিখ্যাত এবং নির্ভীক সাহিত্যিকের নাম করেই প্রসঙ্গ শেষ করি—ইনি বীরবল নামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী। ইনি

চলতি ভাষার রূপান্তর

গুরুগম্ভীর সাহিত্যেও চলিত ভাষা এবং চলতি রীতি ব্যবহার করে তার শক্তিমত্তা ও স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রকাশ-মানতা যে কত বেশী তা প্রমাণ করলেন। এঁর চলতির মধ্যে কেবল সর্বনাম আর ক্রিয়াগুলোই ছিল কলকাতা অঞ্চলের চলতিরূপ কিন্তু শব্দসম্ভারের অধিকাংশই সাধু তৎসম শব্দ, যথা—

"আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ -"

রবীন্দ্রনাথ এই পথে শেষদিকে চলতি ভাষার যে অদ্ভুত শক্তি ও সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। "তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক। কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

(শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ)

বর্তমানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করব যে, সাধুভাষায় প্রচুর তৎভব দেশী-বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে চলতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর চলতি ভাষাও প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করে গ্রাম্যতা পরিত্যাগে সাধুভাষার নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। পার্থক্যের ব্যবধান ক্রমশই আসছে কমে।

বর্তমান এই দুই রীতির মৌলিক প্রভেদ হচ্ছে একমাত্র ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের

রূপে! যেমন, যাইতেছিল—যাচ্ছিল, দেখিতেছিল—দেখছে, করিতেছিলাম—করছিলাম -লুম লেম ··তাহার—তার, তাহাকে—তাকে তাহাদিগের—তাদের, কেহ—কেউ ইত্যাদি। কতকগুলি অব্যয় শব্দও চলতি ভাষায় পৃথক,—থেকে, হতে, দিয়ে, দরুণ, বাবদে. ইত্যাদি ···তাছাড়া বাংলা ভাষায় যেসব রাশি রাশি বিশিষ্টভাবার্থক বাগধারা প্রচলিত আছে তার যথাযোগ্য স্থান চলতি ভাষায়। সাধুভাষায় তাদের অধিকাংশই অচল।

সাধু ও চলিতের মৌল পার্থক্য

যাইহোক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এককালে সমস্ত এলাকা জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সাধুভাষার। ক্রমশঃ চলতি ভাষাকে অধিকার ছাড়তে ছাড়তে আজ সে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। যেটুকুতে তার অধিকার আজো আছে, সেখানেও সে চলতি ভাষার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আপোষ করে নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা বিখ্যাত উপমা উল্লেখ করে বক্তব্য শেস করি—

"রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই রাণী, দুয়োরাণী আর সুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রাণী: একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা আবার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত-বাংলা। সাধুভাষা মাজা ঘসা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধারকরা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। ·রূপকথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়ালঘরে; কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে। বাংলা চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁসেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর নিকানো আঙিনার পাশে, যেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায়, আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোর বেলাতে।

গল্পের শেষ অংশটা এখনও সম্পূর্ণ আসেনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে—"

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী কতদিনে সফল হবে জানিনে তবে বর্তমানের সহাবস্থান নীতি অনুযায়ী দুই রাণীই আজ রাজান্তঃপুরে সমান সম্মানজনক রাণীর স্থান পেয়েছেন।

অনুশীলনী

রচনায় সাধু ও চলিত এই দুটি ভাষা যাহাতে মিশিয়া না যায় ইহা ভাল করিয়া শিখাইবার জন্য রচনা শিক্ষার্থীকে সাধু ও চলিত বাংলার রূপগত পার্থক্য কিরূপ নির্দেশ দিবে—

(ক: বিঃ—বি. টি. ১৯৫৪)

গল্পবলা ও কবিতা পাঠ

শিশু যখন এই পৃথিবীতে প্রথম ভূমিষ্ট হল, তখন সে কোন দেশের ভাষাকেই সঙ্গে করে আনেনি, জননী এবং জন্মভূমির ভাষা শুনতে শুনতে সে ক্রমশ সেই ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছে অজ্ঞাতসারে। এবং এই আয়ত্তিকরণের মধ্যেই তার আত্মবিকাশের কাজ সুরু হয়েছে।

কিন্তু এই আয়ত্তিকরণ কি ভাবে সুরু হয়? শিশু লক্ষ্য করে যে তাকে কেন্দ্র করে কত বিচিত্র কলকলধ্বনি জলতরঙ্গের মত দিনরাত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শিশুমন সেই জলতরঙ্গে সব সময়েই ডুবে থাকে—নিজেও যোগ দেবার চেষ্টা করে। শিশুর মানসপটে কল্পনার শত রামধনুর ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—বিমুগ্ধ নয়নে সে শোনে ছেলে ভুলানো ছড়া। প্রশ্ন করে—গল্প বল। শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে—গল্পের মধ্য দিয়েই চলে তার কথাবার্তা, চলে তার ভাষা শিক্ষা। দেহ আর মন এই দুই নিয়েই মানুষ। দেহের পুষ্টির জন্য তার ফুসফুস দুটো যেমন অনবরত বাতাস টেনে নিচ্ছে, পাকস্থলী নিচ্ছে খাদ্য আর জল, তেমনি মন বিচিত্র কল্পনার ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেছে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।—এই কল্পনার খাদ্য যোগায় গল্প।—তাই খাদ্য গ্রহণের মতই গল্প শোনার আগ্রহ শিশুদের সহজাত।

সুতরাং শিশুপাঠের প্রথম অধ্যায়টি হল গল্প বলা। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই অপরূপ শিশুগল্পের উদ্ভব ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। অদ্ভুত কল্পনা-প্রবণ শিশুদের মন সত্য-মিথ্যার বাস্তব তার দিয়ে তৈরী যুক্তির কঠিন জালাবরণে শিশুর চক্ষুদুটি তখনও আবদ্ধ হয়ে যায়নি। সমস্ত মনটি তার অসংখ্য চক্ষু দিয়ে গড়া, বাস্তবে যেটা নাই, কল্পনায় সেটা পূরণ করে নিতে তার একটুও বাধে না—সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে বেড়া তখনও উঁচু হয়ে ওঠেনি, অনায়াসেই মনটা এপাশ থেকে ওপাশ ঘোরা ফেরা করতে পারে। তাই এই বয়সের ছেলেদের সবচেয়ে প্রিয় গল্প হল রূপকথা—পরীর গল্প মাদাম মন্তেশ্বরি অবশ্য অসত্য কথনের অজুহাতে এই ধরণের রূপকথা বা পরীর গল্প ছেলেদের বলতে নিষেধ করেছেন। এর ফলে ছেলেমেয়েদের নাকি বাস্তব বিমুখ কল্পনাবিলাসী ভীরু অমানুষ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে।

কথাটা বোধহয় পুরোপুরি সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "—বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অত্যন্ত ক্ষীণ। জগৎ সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিছিন্নভাবে আঘাত করে—একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সুসংলগ্ন কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুকরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য···আমাদের মত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এই জন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোক দেবতার জগৎলীলার অনুসরণ করে—" কাজেই শিশুদের প্রথম স্তরের সবচেয়ে প্রিয় গল্প হল—রূপকথা, পরীর গল্প··· ।

কল্পনাপ্রবণ চিত্তে গল্পের প্রভাব

তারপর শিশুদের নানারকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তাদের কল্পনাপ্রবণ চিত্তের বিচিত্র চিন্তার জল্পনা গল্পাকারে বললে শিশুরা আগ্রহান্বিত হয়ে শোনে। এছাড়া নানারকম জীবজন্তু গাছপালার মুখে কত রকম গল্প তৈরী করেছেন ঈসপ, বিষ্ণু শর্মা প্রভৃতি পূর্বকালের খ্যাতনামা শিশুশিক্ষকগণ।

ক্রমশ শিশু বড় হয়, তার কল্পনা রাজ্যের মাঝখানে বিরাজ করে শিশু স্বয়ং। সেই তখন তার মনোরাজ্যের সম্ভব অসম্ভব ঘটনাপুঞ্জের নায়ক। কখনও সে বীরপুরুষ হয়ে মাকে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার করে, কখনও ফেরিওয়ালা, কখনও ঘাটের মাঝি, কখনও বা হাটুরে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, আবার কখনও বা বিড়ালছানাটির কানাই মাষ্টার। নানারকম অভিযান-মূলক কাহিনী সে উপভোগ করে। শতরকম বিপদের মধ্য দিয়ে বীরদর্পে শিশুমন এগিয়ে চলে······

এইভাবে গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুর ভাষাজ্ঞান বাড়তে থাকে। শিশুর বয়স, মানসিক সামর্থ্য ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। তারপর তা অত্যন্ত সহজ সুন্দর সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে নানা প্রকারের ভাবপ্রকাশক ভঙ্গীতে কণ্ঠধ্বনির যথোপযুক্ত বৈচিত্র্য সম্পাদন করে বক্তব্য বিষয়টিকে শিশুমনে স্পষ্ট করে তুলবেন।

—বলা বাহুল্য, গল্প বলার কৌশলের উপরই গল্পের মাধুর্য অনেকখানি নির্ভর করে। মনে রাখতে হবে, গল্প পড়া অপেক্ষা গল্প বলার প্রভাব অনেক বেশী। গল্পের বই যত চিত্তাকর্ষকই হোক, শুধু পঠনের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে সকলের মনোযোগ

আকর্ষণ করা কঠিন। কিন্তু সেই গল্পটিই যদি শিক্ষক নিজের মন থেকে বলার ভঙ্গীতে মুখে মুখে সহজ স্বচ্ছন্দভাবে বলে যেতে পারেন তবে তার ফল হয় অনেক বেশী। মনে হবে গল্পটা যেন শিক্ষকের নিজেরই তৈরী এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে তা তৈরী হযে চলেছে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, তাঁর ব্যক্তিগত বাচন-কৌশল সমস্ত মিলে গল্পটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠবে ক্লাশে। এইভাবে শিক্ষক যত সহজে সমস্ত শ্রেণীকক্ষে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, এমন আর কিছুতে নয়।

গল্প বলার কৌশল

...কোন কিছু পড়াতে গেলে পূর্ব হতেই তার জন্যে যেমন প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়, গল্প বলার জন্যও তেমনি নিজেকে ভাল করে প্রস্তুত করা দরকার। যে শ্রেণীতে গল্প বলার পাঠ দিতে হবে, গল্পের ভাব ভাষা ভঙ্গী বা শব্দ সব কিছু যেন সেই শ্রেণীর উপযুক্ত হয়। নানা প্রকার ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কিছু কিছু পরিবর্তন করলে গল্পটি সজীব হয়। মনে রাখতে হবে গল্প বলা আর বক্তৃতা করা এক জিনিস নয়। সহজ খোলামেলা আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে শিক্ষক যখন গল্প বলবেন, তখন ছাত্র ও শিক্ষক মিলে যেন একটা একাত্মতার ভাব সৃষ্টি হয় শ্রেণীকক্ষে, তবেই গল্প বলার পাঠ সার্থক হবে।

শিক্ষকের এই গুণগুলি কেবল যে গল্প বলার বেলাতেই কাজে লাগে তাই নয়, সাহিত্য পঠন পাঠনাতেও শিক্ষকের এই গুণগুলি অপরিহার্য।

কাব্য সাহিত্য পড়াতে হলেও কেবল মাত্র ভাষাজ্ঞান থাকলেই চলবে না; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের রসবোধও থাকা চাই।

গল্প বলতে গেলে শিক্ষকের যেমন স্পষ্ট উচ্চারণ, ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন প্রয়োজন, গদ্যপদ্যপাঠের ক্ষেত্রেও সেটি প্রয়োজন।

কাহিনীর ভাবে সম্পূর্ণরূপে ভাবিত না হতে পারলে গল্প বলে জমান যায় না, গদ্য পদ্য পঠন পাঠনাতে শিক্ষককে তেমনি পাঠ্য-বিষয়ের ভাবে ভাবিত হতে হয় নইলে পড়ানো জমে না। গল্প বলার ক্ষেত্রে যে সব কৌশল এবং আঙ্গিক ব্যবহার করা হয়, যে আন্তরিকপূর্ণ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে সহজ ও স্বাভাবিক আন্তরিকতার উদ্ভব ঘটে, সাহিত্য পাঠের সকল দিকেই তার একান্ত প্রয়োজন। ভাল গল্প বলে সকল ছাত্রের মনোযোগ দীর্ঘকাল ধরে আকর্ষণ করে রাখবার দুর্লভ ক্ষমতা যে শিক্ষক রাখে সাহিত্য পাঠেও তিনিই সার্থক শিক্ষক।

গল্প বলা ও সাহিত্য পাঠ

শিশুশিক্ষার প্রথম পর্যায়টি হল এইভাবে কানে শুনে শেখার কাল। প্রথমে শিশু শুনবে শিক্ষক বলবেন, তারপর শিশু বলবে, শিক্ষক শুনবেন। শিশুর চিন্তাধারা মুখের কথায় প্রকাশ করতে শেখার মূল্য অপরিসীম। বড হলে শিক্ষনীয় বিষয়টির পরিচয় আমরা গ্রহণ করি লেখনের মাধ্যমে, অর্থাৎ বড ছেলেরা লিখে পরীক্ষা দেয়— কিন্তু শিশুশ্রেণীতে মুখে মুখে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় শুধু যে বিষয়বস্তুর অর্জিত জ্ঞানেরই পরীক্ষা হয় তা নয়, মনের কথা তাডাতাডি গুছিয়ে বলবার ক্ষমতারও পরীক্ষা হয়। জীবনের যাত্রা পথে ভাবের আদান প্রদান সব সময়েই আমাদের মুখের ভাষায় দিতে হয়, কথাবার্তার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে হয়, সে সময়ে লিখে বুঝাবার সময়ও নেই, সুযোগও নেই। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মৌখিক পরীক্ষার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে যেটা বড়দের পরীক্ষাতেও অনুশীলনযোগ্য।

মৌখিক পাঠদানের প্রসঙ্গে এইবার কবিতা আবৃত্তির কথা বলতে হয়। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার অভ্যাস অনুশীলন করতে হলে যত রকম কৌশল করতে হয়, তার মধ্যে আবৃত্তির স্থান সর্বোচ্চে।

শিশুকালের ছড়া আবৃত্তি থেকে সুরু করে বড বয়সের ভাবপ্রধান রসব্যঞ্জনাময় কবিতা আবৃত্তি সবই একই শক্তির ক্রমবিকাশ। শিশুবয়সের কবিতার ভাবগভীরতা অপেক্ষা কল্পনার লীলামাধুর্য, ধ্বনিব্যঞ্জনা অপেক্ষা ছন্দের নৃত্যচাপল্যের প্রাধান্য বেশী। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন বয়স উপযোগী কবিতা সঙ্কলন করতে হয়। কবিতার উপযোগ আনন্দে কাব্যরসাস্বাদ ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদের সহোদর বলে কাব্যরসিকেরা অনুমান করেন। এই হিসাবে কাব্যপাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কাব্যরসামৃত পানে পরমানন্দ উপভোগ করা।

শিশু চিত্তে কবিতার প্রভাব

এই প্রসঙ্গে ভাষাজ্ঞান ব্যাকরণজ্ঞান প্রাসঙ্গিক ভাবে যদি কিছু আসে আসুক কিন্তু জ্ঞানচর্চা যেন কখনই বড় হয়ে উঠে রসানুভূতিকে নিষ্প্রভ করে না দেয়। কবির অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ, অনির্বচনীয় অনুভূতির আনন্দ ও অপূর্ব রূপ-নির্মিতির কৌশল ধ্বনিসুষমা ও ছন্দব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতানুসারে রসই হল কাব্যের আত্মা এবং সেই রসাস্বাদের আনন্দই হল কাব্যপাঠের আনন্দ। কাব্যপাঠের কালে কাব্যস্থিত রসাত্মক বাক্য সহৃদয় হৃদয়সংবাদী পাঠকের চিত্তে অনির্বচনীয় রসাবেশ ঘটায়, কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাহিত্য অর্থাৎ সংযোগ সাধিত হয়।

সুতরাং কাব্যপাঠদানকালে কাব্যপাঠের এই উদ্দেশ্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য

রেখে পঠনের সার্থকতা বিচার করতে হবে। কবির আনন্দের রসধারা যদি সহৃদয় পাঠকের তদ্গতচিত্তে প্রবাহিত করে দিতে হয় তাহলে কাব্যপাঠের মধ্য দিয়েই সেই রসের সঞ্চরণ ঘটাতে হয়। অতএব কাব্যপাঠ হবে প্রধানতঃ রসসঞ্চারী পাঠ। কাব্যের প্রত্যেকটি শব্দের এক একটি বিশেষ অর্থ আছে এবং সেই অর্থের বন্ধন দিয়ে ঘেরা শব্দসমষ্টি মানবমনে একটি নির্দিষ্ট ভাবচিত্র অঙ্কন করে কিন্তু শব্দ সজ্জার কৌশলে শব্দার্থকে ছাড়িয়ে ধ্বনিব্যঞ্জনা এমন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতির লোকে নিয়ে যায় সেটা কিছুতেই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়, অনুভূতি-গ্রাহ্য। রসসঞ্চারী পাঠের দ্বারা কবিচিত্তের সেই অনুভূতিময় আবেগ পাঠক-চিত্তে সঞ্চারিত হয় এবং ক্রমশঃ পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত রসাপ্লুত ও অভিভূত করে ফেলে। এইখানে কাব্যপাঠের সার্থকতা।

কাব্য পাঠের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

কাব্যপাঠের আরো একটা উপযোগিতা আছে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দবেগে স্পন্দমান। ছন্দ হিল্লোলের আন্দোলনে মানুষ যে আনন্দ লাভ করে সে হল একেবারে প্রাথমিক জৈব আনন্দ। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে সুরু করে একেবারে অণু-পরামাণুর ঘূর্ণন নিয়ত ছন্দাবেগে আবর্তিত, মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস শোণিত প্রবাহ চলেছে ছন্দে ছন্দে, তাই ছন্দের দোলা মানুষের অন্তরে যে আনন্দের ঢেউ তোলে সে হল একেবারে প্রাথমিক জৈব আনন্দ। পরিমিত পদবিন্যাসের ফলে কবিতার বাণীপ্রবাহে যে নৃত্যচপলতা হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, কবিতার সরস পাঠের দ্বারাই সেই আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারি। কবিতার অর্থময় ভাবপ্রবাহের সঙ্গে ছন্দময় রূপপ্রবাহের যুগলমিলন মানবের চিত্তে অভিনব সঙ্গীতপ্রবাহের সৃষ্টি করে। তাই কাব্যপাঠের আর এক উদ্দেশ্য কাব্যের এই সঙ্গীত-ধর্মীতা উপভোগ। সুতরাং কবিতা পঠনের কালে কবিতার সরব পাঠ অপরিহার্য। উপযুক্ত ভূমিকা বা আয়োজন আলোচনাপূর্বক কাব্যের বিষয়বস্তুর দিকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করবার পরই দ্বিতীয় সোপানের প্রারম্ভে স্বর, যতি, ছন্দ, অর্থ ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র কবিতাটির রসসঞ্চারী আদর্শ পাঠ দান করবার প্রয়োজন। কারণ এই জাতীয় আদর্শ পাঠের মাধ্যমেই কবি ও কাব্যরসিকের মনে সাধারণীকৃতি সৃষ্টি হবে। এই হল কাব্যপাঠের ও কাব্য আবৃত্তির সার্থকতা। কিন্তু কাব্য পাঠের সার্থকতা থেকেও কাব্য আবৃত্তির সার্থকতা অধিক। বই খুলে আমরা যখন কাব্যপাঠ করি তখন আমাদের সমগ্র মননশক্তি কাব্যরসাস্বাদে নিযুক্ত থাকতে পারে না, পঠনক্রিয়ার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খানিকটা মনোযোগ রাখতে হয়, অথচ মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করতে হলে সমগ্র মননক্রিয়াই কাব্যরসাস্বাদে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে।

তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে—জীবনের যাত্রাপথে কত বিচিত্র রকম অভিজ্ঞতা দিনরাত আমাদের মনকে অনুরঞ্জিত করে চলেছে, স্থূল জৈব প্রতিক্রিয়ায় তা প্রতিফলিত হচ্ছে সবসময়ে। এই সব অভিজ্ঞতা কবি-চিত্তকেও অনুরঞ্জিত করে অথচ তার প্রতিক্রিয়ায় বেজে ওঠে অপরূপ সঙ্গীতঝঙ্কার। সেইসব সঙ্গীতঝঙ্কার যদি মুখস্থ থাকে তাহলে অনুরূপ অভিজ্ঞতায় আমাদের জড়চিত্ত কবিচিত্তের সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্বর্গীয় সুরে অনুরণিত হতে পারে।

তাই ভাল কবিতা যতবেশী মুখস্থ রাখা যায় ততই ভাল। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে ভাল কবিতা বাছাই করতে হবে এবং সেই সব বাছাই কবিতা সাধ্যমত মুখস্থ করতে সাহায্য করতে হবে।

এইবার মুখস্থ করার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করি—মুখস্থ করার বিজ্ঞানসম্মত সুপদ্ধতি অনুসরণ না করায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুখস্থ করা কাজটা অত্যন্ত ভীতিজনক ও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণতঃ সম্পূর্ণ কবিতাটিকে ভেঙ্গে ভেঙে দু'এক ছত্র করে টুকরো টুকরো ভাবে মুখস্থ করার চেষ্টা করে ছেলেরা। ফলে সই চেষ্টা হয় ক্লান্তিকর এবং ব্যর্থ। তার পরিবর্তে তার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সমগ্র কবিতাটি ধীরে ধীরে বার বার পড়লে কবিতাটি সহজে আয়ত্ত হয়। আনন্দের সঙ্গে যোন কাজ করলে তবেই তা সহজ হয় এবং তার ফল হয় দীর্ঘস্থায়ী। আবৃত্তির সঙ্গে যদি অভিনয় ভঙ্গীর সাহায্য নেওয়া হয় তবে মুখস্থের কাজ আরও সহজ হয়, সুন্দর হয় এবং সার্থক হয়।

অনুশীলনী

১। শিশুসাহিত্যে কবিতার স্থান কতখানি? প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালক বালিকাদের কি ধরণের কবিতা পড়াইবে তাহার নমুনা দাও— (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৪৭)

২। বাংলাভাষার সহিত শিশুর প্রথম পরিচয় কি ভাবে করাইতে হইবে তাহা বিশদভাবে লিখ— (কঃ বিঃ—১৯৪৮)

৩। কবিতা পড়াইবার সময় নিছক পাঠের উপর জোর দেওয়ার বিশেষ কোন আবশ্যকতা আছে কিনা তাহা আলোচনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৫১)

৪। গল্প বলিতে জানিলে শিক্ষকের বাংলা ও সাহিত্য পড়াইবার পক্ষে কি সুবিধা হয়, তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর। (কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৮)

পঠন শিক্ষা

ইতিপূর্বে শুনে শেখার কথা বলা হয়েছে। তার পরের স্তর হচ্ছে পড়ে শেখার কাল। পড়া হল দুইজাতের—সরব পাঠ ও নীরব পাঠ। প্রথমে সরব পাঠের আলোচনা করি। শিশুর অক্ষর পরিচয় হবার পর ক্রমশ সে শব্দ ও বাক্য পড়তে শেখে। এই পড়াটা প্রধানতঃ পঠনের কৌশল আয়ত্ব করবার জন্যই, তারপরে হবে ভাষা শিক্ষার পাঠ এবং সবশেষে সাহিত্য শিক্ষার পাঠ।

সরব পঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক স্তরের পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হবে অক্ষর পরিচয়ের অনুশীলন এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের শুদ্ধ সুষ্ঠু উচ্চারণ। এইভাবে শিশুর শব্দভাণ্ডার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শব্দগুলির সত্যকার উচ্চারণ শিক্ষাও হতে থাকে।

পাঠের সময় কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। অতি উচ্চস্বরে বা অতি নিম্নস্বরে পাঠ করলে সে পাঠ শ্রুতিমধুরও হয়না, ভাব প্রকাশোপযোগী ব্যঞ্জনাও পরিস্ফুট হয় না। বিচিত্র স্বরভঙ্গীর দ্বারা বক্তব্য বিষয়টিকে জনসাধারণের মনে মুদ্রিত করে দিতে হয়। সুতরাং লেখকের মনের বিচিত্র ভাব শ্রোতার মনে ফুটিয়ে তুলতে হলে তা কণ্ঠস্বরের হ্রাসবৃদ্ধির সাহায্য নিলে তবেই ভাল করে করা যায়। সরব পাঠের আর একটা বড় কথা হল বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ। প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্তভাবে স্বরযন্ত্রের সাহায্যে স্বর উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গীটির দিকে শিশুকে অবহিত করতে হয়। শিশুকালে শিশুর বাগযন্ত্র থাকে নমনীয় ও পরিবর্তনক্ষম। সুতরাং বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষার এই হল সময়। এই সময়ে কোন অক্ষরের বা শব্দের ভুল উচ্চারণ অভ্যস্ত হয়ে গেলে বড় হলে তা আর সংশোধন করা সহজ নয়।

বড়দের কথায় অনেক সময়েই উচ্চারণের অনেক ভুল দেখতে পাওয়া যায়। শ স ষ কে অনেকে স বা ছ (S) দিয়ে উচ্চারণ করে, 'সাম বাজারের সসীবাবু' জাতীয় ছ ধরণের স উচ্চারণের একটা মুদ্রাদোষ অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়। র ও ড় এর উল্টাপাল্টা ব্যবহার ও উচ্চারণ ত আজকাল অতি সাধারণ ভুলের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। 'ঘড়বারি' জাতীয় ভুল আজকালকার লেখায় বা বলায় ত হামেশাই দেখা যাচ্ছে। আবৃত্তি শুনতে গিয়ে "মনে কড় যেন বিদেশ ঘুড়ে" ধরণের কথা কত শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

ল ও নয়ের উচ্চারণ বিপর্যয় ত বাংলার একটা আঞ্চলিক মুদ্রাদোষ। নাউ, নঙ্কা, নেবু অথবা লৌকো; লদী প্রভৃতি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কোন কোন অঞ্চলে খুব বেশী শোনা যায়। তেমনি স, শ, ষ কে হ উচ্চারণ। পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে শতায়ু হবার আশীর্বাদ নাকি হতায়ু হবার অভিশাপে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে বলে অনেকে রহস্য করেন। কোনও অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দুর আধিক্যে হাস্য হয় হাঁসি, কোথাও বা তার বিলুপ্তির ফলে হয় চাদ বাশ হাস। এই ধরণের ভুল উচ্চাবণ সংশোধন করতে হলে শিশুকাল থেকেই প্রত্যেকটি বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ অনুশীলন করতে হয়।

মাতৃভাষার উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত। যে ভূখণ্ড জুড়ে বাংলাভাষা ব্যবহৃত, তার উচ্চারণভঙ্গী সর্বত্র এক নেই। চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের ভাষা দেখলেই বোঝা যাবে একই বাংলাভাষা আঞ্চলিক প্রভাবে সরতে সরতে কত তফাৎ হয়ে যেতে পারে। ভাষাবিদেরা সমগ্র বাংলাভাষা ভাষী এলেকাকে মুখের উচ্চারণের দিক থেকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন—আগেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই সব আঞ্চলিক উচ্চারণপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার প্রয়োজন এখানে নাই তবে এইটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়, এত বিভিন্নতার মধ্য থেকেও সারাবাংলায় একটা আদর্শ চলতি ভাষা গড়ে উঠেছে এবং সেই চলতি ভাষা কেমন করে সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে পূর্ব প্রবন্ধে সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক শিশুর উচ্চারণভঙ্গীর উপর পারিবারিক প্রভাব যে যথেষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার সময়ে বর্ণের অক্ষরের ও শব্দের আদর্শ উচ্চারণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

ভাষাশিক্ষার গোড়াতে শিশু আধ আধ কথা বলে, সেটা তার বাকযন্ত্রের অপুষ্টতার জন্য। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাকযন্ত্রের অপুষ্টতা কেটে যায়, উচ্চারণ স্পষ্টতর হয়। বড় হলেও যাদের তা হয় না, বুঝতে হয় তাদের বাকযন্ত্রের দোষ, নয়ত শিক্ষার দোষ। বাকযন্ত্রের দোষ থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল।

আমাদের দায়িত্ব শিক্ষার দোষ সম্বন্ধেই সমধিক। শিশুদের কতকগুলি বদ অভ্যাসের ফলেও উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে—যেমন তোৎলামি, ঘন ঘন নিশ্বাস টানা, সুর টেনে কথা বলা ইত্যাদি। তাড়া দিয়ে, বকে অথবা জোর করে এগুলি ছাড়ান যায় না, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বারা, যত্ন ও স্নেহ দ্বারা ধীরে ধীরে এগুলি দূর করতে হয়।

সবচেয়ে বড় কথা এবং প্রথম কথা হল, যে শিক্ষক বাংলা পড়াবেন বাংলা শব্দের

আদর্শ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট-ধারণা থাকা দরকার। প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণ ভঙ্গীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলারও আছে।* সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষককেই প্রথমে অবহিত হতে হবে, তাহলেই তিনি ছাত্রদের ঠিকমত শেখাতে পারবেন। বাংলায় বর্ণমালা সংস্কৃতে অনুরূপ বটে কিন্তু তার উচ্চারণ সংস্কৃতানুগ নয়, বাঙালীর জিহ্বায় স্বরের হ্রস্বতা দীর্ঘতা নেই, তার পরিবর্তে আছে স্বরাঘাতের তীব্রতা ও ক্ষীণতা। বাংলায় সাধারণতঃ শব্দের প্রথমেই শ্বাসাঘাত পড়ে। পদান্তের স্বরধ্বনি সাধারণতঃ লুপ্ত হয়ে যায়, এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সুস্পষ্ট উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

ধ্বনি বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা

বিদ্যালয়ে পঠন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এবং ভুল হলে যথাসাধ্য সংশোধন করতে হবে। সংশোধনের পদ্ধতি আছে বহু কিন্তু তার আসল কথাটি হচ্ছে সস্নেহ সহানুভূতিশীল ব্যবহার। ছেলের বিকৃত উচ্চারণ নিয়ে শ্রেণীকক্ষে কখনও হাসি রসিকতা করা উচিত নয়। সরব পাঠের সময় যে উচ্চারণ-বিকৃতি ধরা পড়ে, বার বার পাঠের দ্বারাই তা সংশোধন করা যায়।

শ্রেণীকক্ষে অনেক সময় সমস্বরে পাঠ করতে দেওয়া হয়। এর একটা সুবিধা আছে— শুদ্ধ উচ্চারণকারী কোন ছেলে বা শিক্ষকের আদর্শপাঠ অনুকরণ করে সবাই যদি সমস্বরে পাঠ করে, অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের পাঠ সংশোধন হতে পারে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেপুলেরা সমস্বরে চিৎকার করে পড়তে খুবই আনন্দ পায়।

সমবেত পাঠ

তবে সমস্বরে পাঠের একটা অসুবিধাও আছে। অনেক দুষ্টছেলে গণ্ডায় আণ্ডা দিয়ে পড়ায় ফাঁকি দিতে পারে—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তাছাড়া অন্য শ্রেণীকক্ষের পাঠে অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

পঠনশিক্ষার গোড়ার দিকে অর্থাৎ শিশু শ্রেণীর শিশুদের সমস্বরে পাঠ করতে দেওয়া ভাল। তারপর শিশুদের উচ্চারণ কৌশল ক্রমশ আয়ত্তে এলে সমস্বরে পাঠের পরিবর্তে একক সরব পাঠ করতে দিতে হয়।

আরো উঁচু শ্রেণীতে উঠলে সরব পাঠ কমিয়ে দিয়ে নীরব পাঠ করতে শেখাতে হবে। বড়দের মধ্যেও অনেকের চেঁচিয়ে পড়ার অভ্যাস আছে, চেঁচিয়ে না পড়লে তাদের মনঃসংযোগ হয় না। বলাই বাহুল্য এটা বদ-অভ্যাস। বাল্যকালে নীরব পাঠের চর্চা না করার ফলেই এইরূপ ঘটে থাকে।

নীরব পাঠ

সমস্ত শব্দ বা সম্পূর্ণ বাক্যের প্রতিরূপটি মনশ্চক্ষে একসঙ্গে দেখতে পারলে

* এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তবেই নীরব পাঠ করা সম্ভব। ছোট ছোট বাক্য থেকে সুরু করে ক্রমশ বড় বড় লেখা নীরব পাঠের বিষয়বস্তু করতে হয় এবং সরবপাঠের অভ্যাসকে ধীরে ধীরে নীরব পাঠের অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। নীরব পাঠের দ্বারাই রচনার রস সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায়, সমগ্র মনকে রচনার দিকে নিবিষ্ট না রেখেও রচনার বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং সব চেয়ে বড় কথা পঠনের দ্রুততা অর্জন করা যায়। বহুপাঠরত বড়দের কাছে পঠনের এই গুণটির মূল্য যে কত বেশী তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

এছাড়া পাঠের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার দিক থেকেও পাঠন ক্রিয়াকে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। আমরা কবিতা পাঠ করি, জটিল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পাঠ করি এবং দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধও পাঠ করি। বলাই বাহুল্য এই তিন জাতীয় পাঠের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন, সুতরাং পদ্ধতিও বিভিন্ন।

প্রথম কবিতা বা রস-সাহিত্য পাঠের আলোচনা করি। এই প্রকার পাঠের বিষয়বস্তুর বা ঘটনাপুঞ্জ প্রধান কথা নয়। এর প্রধান কথা হল রসোপলব্ধি।

স্বাদনা পাঠ

অবশ্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই রস নির্মিতি ঘটে কিন্তু বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় ব্যঙ্গার্থ, সৃষ্টি হয় ধ্বনিরূপ, অন্তরের মধ্যে ঘটে অনির্বচনীয় রসানুভূতি। এই জাতীয় পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ মাত্র। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে স্বাদনা পাঠ (appreciation study)। স্বাদনা পাঠে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নাই, থাকলেও তা এতই সামান্য যে তার ফলে রসোপলব্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। শ্রেণীকক্ষে সাহিত্য পাঠের সময়ে, বিশেষতঃ কবিতা পাঠের সময়ে যে রসসঞ্চারি পাঠ দেওয়া হয় তাই হল স্বাদনা পাঠ। রস আস্বাদই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। বিচার বিশ্লেষণ, ব্যাকরণের বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশলের কথা একেবারেই "এহো বাহ্য"। বলাই বাহুল্য এই প্রকার স্বাদনা পাঠ বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীতে কাব্য সাহিত্যাদি পাঠের বেলাতেই প্রয়োগ করা যায়।

কিন্তু সর্বপ্রকার রচনাই ত রস সাহিত্য নয়, রসাস্বাদই সব পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। যুক্তি বিচারের দ্বারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্হিত বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝে নিতে হয় অনেক রচনায়। এই প্রকার পাঠের নাম দেওয়া যায় চর্বনা (critical study) পাঠ। মুখের মধ্যে কোন কঠিন খাদ্য নিয়ে

চর্বনা পাঠ

রীতিমত চর্বনের দ্বারা যেমন তাকে নিষ্পেষিত করে ফেলি, এই জাতীয় পাঠ্যকেও আমরা তেমনি বুদ্ধি বিচার দিয়ে ভেঙ্গে চুরে বিশ্লেষণ করে ফেলি। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও তার প্রয়োগ

কৌশলের তাৎপর্য অনুধাবন করে মর্ম গ্রহণ করবার চেষ্টা করি। সাহিত্যের রচনা যেখানে বিষয়বস্তুরই প্রাধান্য, সেখানে চলবে এই চর্বনা পাঠ।

এছাড়া আরো একপ্রকার পাঠ আছে যাতে স্বাদনা চর্বনা এই দুয়েরই প্রভাব অল্পবিস্তর রয়েছে। এই পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য কেবলমাত্র স্বাদ গ্রহণ নয়। আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব গ্রহণও নয়, বক্তব্য বিষয়ের একটা সামগ্রিক তথ্যগ্রহণ মাত্র। খবরের কাগজ পাঠের দৃষ্টান্ত দিয়েছি আগেই।

ধারণা পাঠ

এই পাঠে আমরা রসগ্রহণ বা তত্ত্বগ্রহণ কোনটাই করি না, করি কেবল মাত্র বক্তব্য বিষয়ের মর্মগ্রহণ। এই প্রকার পাঠের নাম আমরা দিতে পারি ধারণা পাঠ (comprehensive study) কারণ বক্তব্য বিষয়টির মূল ধারণাই এক মাত্র লক্ষ্য। কেউ কেউ এখানে এটিকে আয়ত্তিকবণ পাঠ নামেও অভিহিত করেন। বিদ্যালয়ে দ্রুত পঠনের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ধারণা গঠন বা আয়ত্তিকরণ, তাই *এটিকে* আমরা ধারণা পাঠের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে ভাষা ভাল করিয়া শিখাইতে গেলে ধ্বনিবিজ্ঞানের (**Phonetics**) সঙ্গে সামান্য পরিচয় দরকার হয় কি ? হইলে কেন হয় তাই লিখ। (কঃ বিঃ—বি. টি· ১৯৫৬)

২। নীরব পাঠ ও সরব পাঠ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া ৭ম শ্রেণীতে বাংলা পড়াইবার সময় উহাদের কিভাবে প্রযোগ করিবে তাহা বিবৃত কর।

(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৬)

৩। "পাঠ ত্রিবিধ। চর্বণা (**Critical appreciation**) স্বাদনা (**appreciation**) আয়ত্তীকরণ (**Comprehension**)

এই তিন জাতীয় পাঠকে কিভাবে পৃথক করিবেন তাহা দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করিয়া দিন।

(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৯)

বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান

আগেই বলেছি বাংলা বর্ণমালা আকৃতির দিক থেকে না হলেও উচ্চারণের দিক থেকে সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করে চলে। শব্দের মধ্যে বর্ণ যেখানে যেভাবেই থাকুক তার উচ্চারণ হবে একই প্রকার। সংস্কৃত বর্ণমালার এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বাংলা বর্ণমালাতেও দেখা যায়। ইংরাজি বর্ণমালার ধ্বনিরূপের সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করলেই এর এই বৈশিষ্ট্যটির দিকে আমাদের লক্ষ্য পড়বে। ইংরাজি বর্ণমালার ধ্বনিরূপ একরকম নয়। যেমন C বর্ণটির উচ্চারণ কখন ক, কখন চ। G বর্ণটি গ বা জ এই ভাবে প্রায় প্রত্যেকটি বর্ণেরই উচ্চারণ দু'তিন প্রকার। কখন বা বর্ণের বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ লুপ্ত হয়েও যায়। এই উচ্চারণ পদ্ধতি যে খুব নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা তাও নয়। ব্যঙ্গ রসিক জর্জ বার্নার্ড শ তাই ইংরাজি ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতিকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন এই ভাষার GHOTI কে (FISH) উচ্চারণ করা যায় [Laugh —লাফ, সুতরাং gh=ফ, women উইমেন সুতরাং o=ই এবং Tion=সন সুতরাং Ti—স] কিন্তু সংস্কৃত তথা বাংলা বানানের উচ্চারণে তা কখনও হবার যো নেই। শব্দের মধ্যে যেখানেই যে বর্ণ থাকুক না কেন তার উচ্চারণ এক এবং অবিকৃতই থাকবে।

কিন্তু বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যাবে এই গর্বকে পুরোপুরি রক্ষা করে চলা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এক-জায়গায় লিখেছেন —"ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষার বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরাজী বানান-রীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদের পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না: দেখিলাম বাংলা বানানও বাঁধন মানেনা, তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই—"

শুধু বানানই যে বাঁধন মানেনা তাই নয়। উচ্চারণ পদ্ধতিও পদে পদে বাঁধন ছিন্ন করে চলে। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনা করলে এই ব্যতিক্রমের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা নিয়ম ধরা পড়বে।

মোটকথা, আমরা যেমনটি লিখি ঠিক তেমনটি পড়ি না অথবা যেমনটি পড়ি ঠিক তেমনটি লিখি না।

এই লেখা আর পড়ার মধ্যে যে পার্থক্য আছে নিম্নে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি—

স্বরবর্ণের উচ্চারণ রীতি

অ-উচ্চারণ দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও বিকৃত।

(১) স্বাভাবিক উচ্চারণ—ইংরেজি law, tall ইত্যাদি উচ্চারণের মত অবিকৃত অ, জল, ফল, অবাক, কথা ইত্যাদি।

(২) বিকৃত উচ্চারণ—ও-কারের মত বিকৃত, মন (মোন) যদি (যোদি) নব্য (নোব্য) সত্য (সোত্তো)।

অন্ত্য অ-কার কোথাও উচ্চারিত (গৃহ, দেহ পুলকিত)।

কোথাও অনুচ্চারিত (হাত্‌, এল্‌, দেশ্‌)।

কোথাও বা ও-কারবৎ উচ্চারিত (ভালো, বড়ো, যতো)।

আ—সংস্কৃত আ-কার দীর্ঘস্বর হলেও বাংলায় উচ্চারণ হ্রস্ব। তবে কোন কোন সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে দীর্ঘতা রক্ষিত হয়···মহাভারত ; অধিনায়ক—

ই-ঈ—উচ্চারণের কোন পার্থক্য নাই তবে কথার জোর দিতে গেলে দীর্ঘ উচ্চারণ করা হয়।

সে কি খাবে ? (প্রশ্ন) সে কী খাবে (বস্তুর উপর জোর) কী সুন্দর ! (উল্লাস)

উ-ঊ—উচ্চারণের কোন পার্থক্য নাই, সর্বত্রই হ্রস্ব উচ্চারণ।

ঋ—উচ্চারণ বাংলা ঋ-এর মত—ঋণ (রিণ) ঋষি (রিষি) অমৃত (অম্রিত)।

ৠ ঌ—বাঙলায় উচ্চারণ নাই, ব্যবহার নাই।

এ—উচ্চারণ দুই প্রকার—স্বাভাবিক ও বিকৃত।

(১) স্বাভাবিক উচ্চারণ—কেশ, বেশ, দেশ······

(২) বিকৃত উচ্চারণ—এক (অ্যাক), খেলা (খ্যালা), পেঁচা (প্যাঁচা)··· ·

ঐ-ঔ—এই দুটি যৌগিক স্বর—অ+ই এবং অ+উ উচ্চারণের সময়ে এই দুইটি স্বরধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়।

গৌরব (গউরব) সৈনিক (সইনিক)

ও—বাঙলায় দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, সর্বত্রই হ্রস্ব উচ্চারণ।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ রীতি

ঙ—কণ্ঠ নাসিক্য ধ্বনি—বাঙলায় উচ্চারণ ং র মত—রঙ্ (রং) বাঙলা (বাংলা)

ঞ—তালব্য নাসিক্য ধ্বনি—উচ্চারণ অনেকটা ইঅ'র মত—মিঞা।

তবে চ, ছ এর পূর্বে যুক্ত হলে ন-এর মত উচ্চারিত—অঞ্চল, (অন্চল) ঝ' (ঝন্ঝা)।

জ এর পরে যুক্ত হলে গর্গ গঁ্য এর মত উচ্চারিত বিজ্ঞ, (বিগর্গ)।

ণ ন—বাঙলায় এই দুইটই ন দন্ত্য নাসিক্য ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

য (য়) সংস্কৃতে ই+অ, কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ জ-র মত।

য় বর্ণটি সংস্কৃতে নাই, বাংলা বর্ণমালায় নূতন সৃষ্টি।

ব (বর্গীয়) ব (অন্তঃস্থ)—এই বর্ণের উচ্চারণের পার্থক্য নাই।

শ-ষ-স—উষ্মবর্ণের এই তিনটি শিসধ্বনি যথাক্রমে তালু, মূর্ধা এবং দন্ত থেকে উচ্চারিত হবার কথা কিন্তু বাংলায় এই তিনটি উচ্চারণের কোন পার্থক্য নাই সবগুলিই তালব্য-শ হিসাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে সংযুক্ত বর্ণে সকলক্ষেত্রে আবার স-এর উচ্চারণ দেখা যায়,

যেমন—শৃগাল, শ্রীমান, স্বজন, স্নান।

হ্য—য-ফলার সঙ্গে যুক্ত হলে জ্ ঝ এর মত উচ্চারণ হয়, যেমন

সহ্য—সজ্ ঝ, গ্রাহ্য গ্রাজ্ ঝ

ং—উচ্চারণ ঙ র মত।

ঃ—সর্বত্রই অন্য বর্ণের পরে থাকে। বাংলায় শব্দের অন্তে ঃ উচ্চারণ স্পষ্ট নয়-ক্রমশঃ (ক্রমশ) পুনঃ (পুন), শব্দের মধ্যে থাকলে পরবর্তী বর্ণকে দ্বিত্ব করে দুঃখ (দুখ্খ)।

ঁ—বর্ণের উচ্চারণকে অনুনাসিক করে দেয়—চাঁদ, বাঁশ।

সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ রীতি

সংস্কৃতে শব্দের মধ্যে বর্ণ সংযুক্তভাবে লিখিত হলেও প্রত্যেকটির উচ্চারণ পৃথকভা[illegible] হয়, কিন্তু বাংলায় সকল বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না, কোথাও বা মিশ্র উচ্চারণ হ[illegible] যেমন মহাত্মা—সংস্কৃতে উচ্চারণ মহাত্মা বাংলায় মহাত্ তাঁ, পদ্ম—পদ্‌ম ও পদ্দঁ

(১) য-ফলা ব ফলা—শব্দের প্রথমে বসলে এদের ইঅ, ওঅ উচ্চারণ ঠি[illegible] থাকে—ব্যয়, ব্যাগ, স্বাধীন। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে বসলে পূর্ব ব্যঞ্জনকে দ্বি[illegible] করে—ভাগ্য—ভাগ্‌গ, সত্য—সত্‌ত বাদ্য—বাদ্দ, বিদ্যা—বিদ্দা— বিদ্বান-বিদ্দান, পক্ব—পক্‌ক, অশ্ব—অশ্‌শ।

(২) **ক্ষ (ক্‌ষ)**—শব্দের প্রথমে বসলে খ-এর মত, **কিন্তু** মধ্যে বা শেষে বসলে ক্‌খ-এর মত উচ্চারিত হয়—

ক্ষুধা—খুধা, ক্ষীর—খির, ক্ষুদ্র—খুদ্র।

পক্ষী—পক্‌খী, বৃক্ষ—বৃক্‌খ, বক্ষ—বক্‌খ।

(৩) **ম ফলা**—পূর্বের ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব এবং অনুনাসিক করে।

আত্মা—আত্‌তাঁ, পদ্ম—পদ্দঁ।

কিন্তু 'ক্ষ'-এর সঙ্গে ম-ফলা থাকলে আর অনুনাসিক হয় না।

লক্ষ্মী—লক্‌খী।

(৪) **জ্ঞ (জ্‌ ঞ)**—শব্দের মধ্যে থাকলে এর উচ্চারণ গ্‌ ও গঁ-এর মত হয়। যেমন, বিজ্ঞ—বিগগঁ, যজ্ঞ—যগগঁ।

কিন্তু শব্দের প্রথমে বসলে জ্ঞ-এর উচ্চারণ গ্যঁ এর মত হয়।

জ্ঞান গ্যঁান' জ্ঞাতি গ্যঁাতি।

শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তনের বিশেষ রীতি

১। **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ**—উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যকার সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরধ্বনি আনা হয়—একে বলে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ যেমন=ধর্ম—ধরম, ভক্তি—ভকতি, শ্লোক—শোলোক

২। **স্বরসঙ্গতি**—অনেক সময় পদের পূর্বের বা পরের স্বর-ধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত অন্য আর একটি স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, এবং এইভাবে স্বরের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য ঘটে—বিলাতি বিলিতি, দেশী—দিশী, তুলা—তুলো, মিছা—মিছে, অতি—ওতি

৩। **অপিনিহিতি**—শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকলে আগে থাকতেই তা উচ্চারণ করে ফেলবার রীতি পূর্বে সারা বাংলাতেই ছিল, বর্তমানে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত।

ই-কারের—অপিনিহিতি রাখিয়া—রাইখ্যা, আজি—আইজ উ-কারের অপিনিহিতি- সাধু—সাউধ, গাছুয়া—গাউছ্যা

শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন

৪। **অভিশ্রুতি**—পূর্ববঙ্গে অপিনিহিতির—রীতি আজও প্রচলিত **কিন্তু** পশ্চিমবঙ্গে সেই পূর্বোচ্চারিত ই বা উ পূর্বের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

দেখিয়ে—দেইখ্যা (অপিনিহিতি)—দেখে (অভিশ্রুতি) করিয়া—কইর‍্যা (অপিনিহিতি)—করে (অভিশ্রুতি) মেছুয়া—মেছো, গাছুয়া—গেছো।

৫। **অক্ষরলোপ**—স্বরাঘাতের ফলে কখনও কখনও শব্দের মধ্যেকার এক একটি অক্ষর (syllable) লুপ্ত হয়ে যায়

পিশিশাশুড়ী>পিশশাশ্>পিশাস,, আটমাসিয়া>আটাসিয়া>আটাসে।

৬। **বর্ণাগম**—অর্থের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েও শব্দের মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কখনও কখনও নূতন বর্ণের আগম ঘটে।

পূর্বাগম—ষ্টিমার—ইষ্টিমার, স্কুল—ইস্কুল, স্পর্ধা—আস্পর্ধা।

মধ্যাগম—অম্ল—অম্বল

অন্ত্যাগম—ইঞ্চ—ইঞ্চি, বেঞ্চ—বেঞ্চি

৭। **বর্ণবিপর্যয়**—অনেক সময় পাশাপাশি দুইটি বর্ণ স্থান বিনিময় করে বাকস—বাস্ক, রিক্সা—রিসকা, ট্যাকস্—ট্যাস্ক।

৮। **সমীভবন**—পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনবর্ণ তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে একরকম হয়ে যায়—

পাঁচ+জন—পাঁজ্জন; গল্প—গপ্প, ধবতে—ধত্তে, কর্ম—কম্ম

৯। **অসমীভবন**—পাশাপাশি একই ব্যঞ্জনবর্ণ দু'বার আসলে অনেক-সময় একটা ব্যঞ্জনবর্ণে পরিবর্তিত হয়ে যায়—

শরীর—শরীল,

১০। **স্বরাঘাত**—উচ্চারণের সময় শব্দের প্রথম অক্ষরের উপর প্রবল স্বরাঘাত বা ঝোঁক দেওয়া হল বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য।

আ'ম, ফ'ল, দে'শ,।

১১। **দ্বিমাত্রিকতা**—প্রথম অক্ষরে স্বরাঘাত দিয়ে জোর দেবার ফলে পরবর্তী অক্ষরগুলি দুর্বল হয়ে যায়। তার ফলে তিনচার মাত্রার শব্দগুলি সংকুচিত হয়ে দুই মাত্রায় পর্যবসিত হয়।

পাগলা—পা'গ্লা, জানালা,—জা'নলা অপরাজিতা—অপ্রাজিতা।

লিখন শিক্ষা

ভাষার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। অথচ শুধু এই ভাবে ভাব প্রকাশের কার্যটি কেবলমাত্র বর্তমান কাল ও সমুপস্থিত পাত্রকে উপলক্ষ্য করেই ঘটতে পারে! অনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ভাবীকালের উদ্দেশ্যে কোন ভাব নিবেদন করতে হলে শুধুমাত্র মৌখিক ভাষায় তা করা সম্ভব নয় একথা ত বলাই বাহুল্য। কিন্তু অসম্ভব বলে থেমে থাকবার পাত্র ত মানুষ নয় .তাই সে তার মৌখিক শব্দগুলিকে কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে স্থায়ীরূপ দেবার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে কতরকম ভাবে যে এই চেষ্টা চলেছে তার আর ঠিক নেই। সামাজিক জীব মানুষ—পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ত তাকে সব সময়েই করতে হয়, তাছাড়া অতীত দিনের অভিজ্ঞতার সম্পদ সম্বল করেই ত মানুষ আগামী দিনের জয়যাত্রা সুরু করে কিন্তু সেই অতীতের ভাবসম্পদগুলি সে ধরে রাখবে কি করে? কি করে সে পৌঁছে দেবে সে সম্পদ উত্তর পুরুষের হাতে? সুতরাং মানুষ তার মুখের উচ্চারিত ক্ষণস্থায়ী শব্দ প্রবাহকে নানাপ্রকার রেখার বন্ধনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছে কখনো পাথরে, কখনো কাঁচা মাটির গায়ে, কখনো গাছের পাতায়, কখনো কাগজে।

লিপিতত্ত্ব ও লিপিরূপ

এই সব রেখাগুলিই হল উচ্চারিত ধ্বনির প্রতীক চিহ্ন মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের বিচিত্র কাহিনীর আলোচনা অবশ্য বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক। যাই হোক এই ভাবে গড়ে উঠল লিপিতত্ত্ব, সৃষ্টি হল লিপিরূপ, উদ্ভব হল বর্ণ অক্ষর।

সামাজিক মানুষের মুখের ভাষার যেমন একটা সর্বজনবোধ্য সামাজিক রূপ আছে, তার প্রতীক চিহ্নেরও তেমনি সর্বজনবোধ্য সুন্দর ও সরল রূপ থাকবার কথা। —মাতৃভাষা ত শিশু মায়ের মুখ থেকে এবং পরিবেশ থেকে অজ্ঞাতসারেই শিখে নিচ্ছে কিন্তু তার পিছনে মানুষের হাজার হাজার বছরের সাধনার ফল প্রতীকচিহ্নগুলির যে সব সমাজগ্রাহ্য রূপ আছে, সেগুলি অনুশীলন সাপেক্ষ—শিশু মাতৃভাষা বলতে শেখে অজ্ঞাতসারে এবং স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু লিখতে শেখে অত্যন্ত পরিশ্রম করে। তাই বর্তমানে শিশু-শিক্ষার একটা বড় অংশই হল লিখন শিক্ষা। তাই লিখন-শিক্ষানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু লিখন-শিক্ষানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে লিখনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। আমরা যখন আমাদের মনের ভাবানুরূপ

ভাষার যথোপযুক্ত প্রতীকচিহ্নগুলি সাজিয়ে যাই অর্থাৎ যখন আমরা লিখি তখন অবশ্যই সেই চিহ্নগুলি অপরের মনে অনুরূপ ভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে এই আশা রাখি। বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, অসংখ্য মানবের মনে কত অসংখ্য ভাবসম্পদ ফুটে উঠেছে এবং উঠবে তার সব পরিচয় আমরা চাই, তাই নিয়েই আমরা এগিয়ে চলব। সভ্যতার অগ্রগতি চলবে অব্যাহত। দেশে দেশে কালে কালে মানুষ খণ্ডিত কিন্তু ভাবলোকে তারা এক এবং সেই ঐক্যলোকের বার্তা বহন করে লিপি বিশ্বমৈত্রীর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাছাড়া মানুষের মনের অস্ফুট আবেগ ভাষার মধ্যে খানিকটা রূপ গ্রহণ করলেও লেখার মধ্যে যেমন সুস্পষ্ট সুসীমিত ও পারম্পর্যযুক্ত হয়ে ওঠে এমন আর কিছুতেই নয়। ইংরাজীতে বলে "writing makes a man perfect" অর্থাৎ লেখার ফলেই মানুষের চিন্তাগুলি সুসম্পূর্ণতা লাভ করে। কারো কারো হস্তলিপির মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব নাকি অনেকখানি প্রকাশ পায়। আলপোর্ট, ডাউনি প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদেরা ত মানসিক শক্তিবিচারে হস্তলিপির উপর অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। যাইহোক, সুন্দর হস্তাক্ষর যে লেখকের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পবোধের পরিচয় দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লিখন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন শিক্ষার প্রয়োজনীতা এবং গুরুত্ব যে কত বেশী তা বলাই বাহুল্য।

প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে মানুষ লেখে এবং সেই লেখা অনুসারে পড়ে। অথচ লেখা অপেক্ষা পড়া সহজ। বর্ণের রূপ এবং তার উচ্চারণটি একান্তই মস্তিষ্কের ব্যাপার এবং বুদ্ধিনির্ভর, কিন্তু লিখনে চাই তার সঙ্গে পেশী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্যবোধ।

আজ আমরা হয়ত সহজ সরল সচ্ছন্দ গতিতে অতিদ্রুত লিখে যাচ্ছি কিন্তু এই লিখন কার্যের পিছনে পৈশিক ও মানসিক ক্ষমতার সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ-নৈপুণ্য বড় সহজে আয়ত্তে আসেনি। একটি শিশুর লিখন প্রচেষ্টাকে পর্যবেক্ষণ করলেই তার শিক্ষার পথের বন্ধুরতা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হবে।

শিশুদের লিখন বৈশিষ্ট্য

শিশু প্রত্যেক বর্ণটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখে, শব্দের মধ্যে বর্ণপ্রবাহের নিরবিচ্ছিন্ন রূপ তার মনে কোন ছবি ফেলেনা। তাই বর্ণটির প্রত্যেক অংশের প্রতি তার অখণ্ড মনোযোগ, প্রত্যেক অংশটি সে সমান জোরে সমান চাপে লিখতে চায়, তার ফলে শব্দের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। প্রত্যেক বর্ণে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগ দেবার ফলে

লেখা হয় ছন্দহীন এবং অসমান—লিখনের পেশীকে পরিচালনা করে চক্ষু এবং বুদ্ধি অথচ বড়দের বেলায় পেশী নিয়ন্ত্রণেই নিয়ন্ত্রিত হয় অক্ষরের ছাঁদ—মন ও বুদ্ধি বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ালেও কোন অসুবিধা হয় না।

বর্ণের সকল অংশে চাপ সমান লাগে না, আঙুলের পেশির সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে সরু মোটা টানে গড়ে ওঠে এক একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ। শিশুর লিখনকে এই স্বাভাবিক সুন্দর স্বয়ংক্রিয় পৈশিক কার্যে পরিণত করতে হলে শিশুমনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক অংশে লিখনের উপকরণ ও পরিবেশ-মার্জনা। কালি কলম কাগজাদি উপকরণ ও শ্রেণী কক্ষের আলোক ব্যবস্থা, টেবিল চেয়ারের উচ্চতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কালি যেন চুপসে না যায়, কলম যেন শিশুর আঙুলের পক্ষে খুব সরু বা খুব মোটা না হয়ে যায়, কাগজ যেন বেশী চকচকে হয়ে আলোক প্রতিফলন না করে, টেবিল চেয়ারের উচ্চতা যেন ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতা অনুসারে হয়,…এই সব বহিরঙ্গ দিকটা সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর আভ্যন্তরীণ অংশে মনের ক্রমবিকাশের পরিচয় নিতে হবে।

লিখন শিক্ষার দুই দিক

আত্মবিকাশের সহজাত প্রবৃত্তিবশে শিশু দিনরাত আঁকি-ঝাঁকি করে বেড়াতে চায়। হাতে কোন কাঠকয়লা বা ফুলখড়ি পেলে সারা বাড়ী নানারকম দাগ কেটে কেটে বেড়ায়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকেই লিখন শিক্ষার মৌলিক প্রেরণা হিসাবে কাজে লাগাতে হবে।

শ্রেণী কক্ষের দেয়ালে অনেকখানি করে সিমেন্টের বোর্ড তৈরী করে রাখতে হয়, সেখানে ইচ্ছামত হিজিবিজি কাটে, ছবি আঁকে। এই ধরণের খেলায় আঙুল দিয়ে লেখন যন্ত্র ধরার অভ্যাস হয় এবং সরু মোটা দাগ দেবার পেশী নিয়ন্ত্রণও কিছু কিছু শেখা হয়।

এরপর এই যথেচ্ছ দাগগুলিকে নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে হয়। বোর্ডে বড় বড় করে গোল চৌকোণা, তেকোণা নকসা এঁকে শিশুকে রঙীন চক দিয়ে তা ভরাট করে দিতে হয়। ভরাট করায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিশু নিজে থেকেই নানা আকারের নকসা আঁকতে পারবে। এরপর বর্ণমালা ভরাট করা এবং লেখা বর্ণের উপর দাগ বুলান অভ্যাস করাতে হয়। এতদিনে শিশু পেশীশক্তির কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এইবার স্মৃতি থেকে বর্ণ যোজনা শেখাতে

কেমন করে লিখবে

হবে। তার আগে বর্ণের আকৃতি সম্বন্ধে শিশুর মনে স্পষ্ট ছাপ পড়া চাই। শুধু মনের গায়ে ছাপ পড়লে হবেনা, আঙুলের পেশীতেও তার ছাপ পড়া চাই। তাই খসখসে শিরিষ কাগজে অক্ষর,

কেটে শিশুকে তারি উপর বুলাতে দিতে হয়, বালি বা তেঁতুল বিচি দিয়ে বর্ণ রচনা করতে দিতে হয়। এই ভাবে বর্ণ পরিচয় হয়ে গেলে শিশু তার চিত্র আঁকতে পারবে মন থেকে। এই কাজে দরকার হবে বর্ণমালার স্মৃতিচিত্র ও পেশী সঞ্চালন ক্ষমতার সমন্বয়।

ক্রমশ আসবে বর্ণগুলির সুনির্দিষ্ট ছাঁদ ও তাদের আকারগত সমতা, তারপর বর্ণগুচ্ছের সামঞ্জস্য বিধান, যার ফলে বিবিধ বর্ণে গড়া শব্দের একটা সুসংবদ্ধ রূপ ফুটে উঠবে।

বর্ণ সাজিয়ে এবং শব্দ সাজিয়ে বাক্য গড়ে ওঠে এবং বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি অন্তর্বর্তী ব্যবধানের সম তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই বাক্যগুলি যাতে কাগজের উর্ধ্বপ্রান্তের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে লিখিত হয় সেইজন্য লাইন টানা কাগজে লিখন অভ্যাস করতে হবে।

—এইবার প্রশ্ন—শিশু কি লিখবে?

—লেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পড়া চলছে। শিশুর অজানা কঠিন ও অপরিচিত শব্দের লিখন অপেক্ষা পড়া বিষয় অবলম্বনে লেখন অভ্যাস করাই মনস্তত্ত্বসম্মত। যে বাক্যের অর্থ শিশু জানে সেই বাক্য লিখতে শিশু সাধারণতঃ আনন্দ পাবে।

কি লিখবে

শিশুর নবজাগ্রত অস্মিত্ববোধকে উদ্বোধিত করবার জন্য তার নিজের নাম নিজের সংগৃহীত চিত্রাবলীর পরিচয় লিপি, বিদ্যালয়ের বিবিধ অনুষ্ঠানের কার্যসূচী লিখিতে দিলে শিশুর আত্ম-প্রকাশের আনন্দ, লেখার বিরক্তিকর কার্যকে আনন্দময় করে তোলে। শিশু ছবি আঁকবে, গল্প লিখবে, বন্ধু বান্ধবকে চিঠি লিখবে, এইভাবে খেলাচ্ছলে লেখাকে আনন্দময় করে তুলতে পারলে অনেকখানি পরিশ্রমের লঘুতা ঘটবে। সবশেষে লেখাকে সুন্দর করতে হবে। এরজন্য আদর্শ ভাল হাতের লেখা ছেলের সামনে রাখতে হয়। অজ্ঞাতসারে তা শিশুর সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে, লেখার ছাঁদকে সুন্দর করে তোলে। মোট কথা শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজাত প্রবৃত্তিকে, কর্মপ্রিয়তার প্রবৃত্তিকে, ও ক্রীড়া প্রবৃত্তিকে লেখন কার্যে অভিযোজিত করতে পারলে লিখন শিক্ষার বিরক্তিকর কাজ আনন্দময় হয়ে ওঠে, অল্প আয়াসেই শিশু ভাল লিখতে শেখে।

১। কিভাবে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করা উচিত? লেখন কখন শিখাইবে?
(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৪৬)

২। হাতের লেখা কি করিয়া শেখান যায়? এ বিষয়ে শ্রুতি লিখনের স্থান কোথায়?
(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫০)

৩। হাতের লেখা শিখাইবার উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া ইহা শেখান যায়? এ বিষয়ে শ্রুতিলিখনের স্থান কোথায়?
(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৫

ব্যাকরণ শিক্ষা

মনের ভাবগুলি আমরা মুখের ভাষায় প্রকাশ করি এবং এক এক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রকাশ ভঙ্গীরও একটা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আছে। উচ্চারণভঙ্গী শব্দগঠন বাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতি সবদিক দিয়েই সে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়, নইলে ভাষার সর্বজনীনতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক ভাষারই পিছনে রয়েছে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মশৃঙ্খলা এবং এই নিয়মশৃঙ্খলাই হল ভাষার ব্যাকরণ। অস্থি কঙ্কালের সুকঠোর কাঠামোকে অবলম্বন করে যেমন সুন্দর লাবণ্যময় দেহের লীলা, তেমনি রসাল সাহিত্যের অভ্যন্তরেও রয়েছে নিয়ম। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে"। মোট কথা ব্যাকরণ হল ভাষা শরীরের শারীরতত্ত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞান।

ব্যাকরণ কাকে বলে ?

আগেই বলেছি আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করি তখন তার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও প্রয়োগতত্ত্বের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায়। যেখানে পাওয়া যায়না সেখানে ভাষা ব্যবহারে ভুল হয়েছে বুঝতে হবে সুতরাং সুষ্ঠু ভাষা-প্রয়োগ শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে একথা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই কি তাই ?

ছেলেরা মাতৃভাষা শিক্ষা করে জননীর মুখ থেকে,জন্মভূমির পরিবেশ থেকে। প্রত্যেকটি ভাবের রূপ ভাষার মধ্যে সুন্দর ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে তারা শেখে, ব্যাকরণ না শিখেও। আগে ভাষা, তারপরে তার ব্যাকরণ। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে কখন ভাষা তৈরী হয় না বরং ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সব সূত্র পাওয়া যায় তা' থেকেই ব্যাকরণ তৈরী হয়েছে। সুতরাং ছেলেরা যে ব্যাকরণ সূত্র জেনে তারপর ভাষা ব্যবহার শিখবে তা নয় অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখবার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা অপরিহার্য নয়।

ব্যাকরণ শিখব কেন ?

তবে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করতে হলে তার ব্যাকরণের আইন মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ মাতৃভাষা আবেদন হৃদয়ের কাছে. বিদেশীর ভাষার আবেদন বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে আয়ত্ত করতে হয় তার বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হয় সর্বাগ্রে। বাংলাভাষার ব্যাকরণও প্রথমে প্রয়োজন হয়েছিল বিদেশীদের শিক্ষার জন্যই। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী

ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ ?

ফাদার ম্যান্থু এল-ত্ত-আস্থম্পসাঁও সর্বপ্রথম ফিরিঙ্গিভাষায় বাংলাব্যাকরণ রচনা করেন, তারপর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব ব্যাকরণ রচনা করলেন বাংলাভাষায়। রাজা রামমোহন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন ইংরেজী ভাষায় এবং সাত বৎসর পরে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য এই ব্যাকরণ অবাঙালীদের বাংলা শেখানর উদ্দেশ্যে রচিত। তারপর লোহারাম শিরোরত্ন, যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার প্রমুখ সুধিবৃন্দ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করে বাংলাভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের একটি স্বরূপ নির্ণয় করেন।

যাই হোক, একটা কথা আমরা অবশ্যই মানব, বাঙালী ছেলেদের বাংলা শেখার জন্য ব্যাকরণ চর্চা করা অপরিহার্য নয়। এছাড়া ব্যাকরণ শেখাবার আরো একটা কারণ সেকালে সব দেশেই মানা হত।

পূর্বে মনস্তত্ত্ববিদেরা মনকে কতকগুলি মানসিক বৃত্তির সমষ্টি বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে এই বৃত্তিগুলি হল অন্য-নিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ—যে কোন বিষয় অবলম্বন করে এই সব বৃত্তির অনুশীলন করলে নাকি তার উৎকর্ষ ঘটে। ব্যাকরণ চর্চার দ্বারা যুক্তি বিচার প্রভৃতি মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন ঘটে সুতরাং ব্যাকরণ চর্চা ব্যাকরণের জ্ঞানার্জনের জন্য যত না হোক, মনের এই অতি প্রয়োজনীয় বৃত্তিটির উন্নতি সাধনের জন্যেও বিদ্যালয়ে একান্ত আবশ্যিক হিসাবে গৃহীত হত। বর্তমানে অবশ্য মনের এই বৃত্তিমূলক মতবাদ ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের জ্ঞানার্জন ছাড়া ব্যাকরণ চর্চার অন্য কোন সার্থকতা আজকাল আর কেউ স্বীকার করবেন না। মোটকথা দেখা যাচ্ছে ভাষা জ্ঞানের জন্যও ব্যাকরণ চর্চা অপরিহার্য নয়, মনের বৃত্তি-বিকাশের জন্যও নয়। তাহলে বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পঠনপাঠনার প্রয়োজনীয়তা কী?

মানসিক শক্তি বিকাশে ব্যাকরণ?

প্রয়োজনীতা আছে—ভাষা শিক্ষার অপরিহার্য প্রস্তুতির জন্য নয়, তার বিশুদ্ধ ব্যবহারের সহায়ক হিসাবে—

(ক মাতৃভাষা আমরা অবশ্য শুনে শিখি। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষা গঠনের বিজ্ঞান জানা থাকলে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ সহজ হয়। (খ) শব্দের বুৎপত্তি জানা না থাকলে কানে শুনে আন্দাজে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায়ই আমরা ভুল অর্থে শব্দ ব্যবহার করে ফেলি, ব্যাকরণ জ্ঞান এই জাতীয় শব্দের অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করে। (গ) ষত্ব ণত্ব ও কৃৎ তদ্ধিতাদি শব্দ গঠন প্রণালীর সূত্র জানা থাকলে বর্ণাশুদ্ধির

বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের সহায়ক ব্যাকরণ

সম্ভাবনা অনেক কমে। (ঘ) বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য জানা থাকলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারি। (ঙ) বাক্য বিশ্লেষণের কৌশল জানা থাকলে জটিল ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অর্থগ্রহণ সহজ হয়। (চ) বর্তমানের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় ভাষা শিক্ষা দেবার সময় শিশুর বয়স রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের নির্বাচন ও তার ক্রমপর্যায় নির্ণয় করতে হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষা বিশ্লেষণ না করলে এই জাতীয় শ্রেণীকরণ সম্ভব হয় না। ব্যাকরণ এই কার্যে আমাদের সাহায্য করে। (ছ) সবচেয়ে বড় কথা ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাব্যবহারে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করে। প্রত্যেকটি শব্দ বা বাক্য বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করবার মত জ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ভাষার ব্যাকরণ হল সেই ভিত্তি। এই হিসাবে ভাষাশিক্ষার্থী ব্যাকরণ চর্চার সাহায্যে তার ভাষাজ্ঞানকে সম্পূর্ণতা দান করতে পারবে। শুনে শেখার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আর নিশ্চয়তা আছে, ব্যাকরণ শিক্ষা তা দূর করতে পারবে।

এই হল ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতিটা কি হবে? আগে ব্যাকরণ শিক্ষা হত অবরোহী প্রণালীতে অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্রগুলি প্রথমে মুখস্থ করিয়ে নিয়ে তারপর দৃষ্টান্ত সহকারে তার প্রয়োগ দেখান হত। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। বর্তমানে ব্যাকরণ শিক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়ে থাকে।

ব্যাকরণশিক্ষার পদ্ধতি

প্রথমতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা সুরু হবে শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট মানসিক পরিণতির পর। শিশু যখন বিমূর্তচিন্তা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা বিকশিত হয়েছে এবং ভাষার ব্যবহারের কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত করেছে তখনই মাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পাঠ পরিচালনা হবে অবরোহী প্রণালীর পরিবর্তে আরোহী প্রণালীতে অর্থাৎ সূত্র থেকে দৃষ্টান্তে না গিয়ে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করে সূত্র নির্মাণ করতে হবে। অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দ বিশ্লেষণ করে তার গঠন কৌশলের দিকে ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পর তা থেকে সূত্র নির্মাণ করতে হবে ছাত্রের সাহায্যে। পূর্বেই বলেছি, আগে ভাষা তারপর ব্যাকরণ। ছাত্রের পরিচয় ভাষার সঙ্গেই হয় প্রথম। সুতরাং ছাত্রের পরিচিত ভাষা অবলম্বন করে ব্যাকরণের সূত্র সন্ধান করলে তবেই তাতে ছাত্রের আগ্রহ জাগবে এবং ব্যাকরণ শিক্ষা হবে বাস্তব ও অর্থপূর্ণ, নইলে ব্যাকরণ সূত্রগুলি একেবারেই অর্থহীন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হবে।

এইভাবে সূত্র নির্মিত হলে তা থেকে অবরোহী প্রণালীতে নূতন নূতন শব্দ

বিশ্লেষণ করে সূত্রের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে ছাত্র। প্রয়োগের সাহায্যেই অর্জিত জ্ঞানের উপর ছাত্রের অধিকার জন্মে। সুতরাং কেবল মাত্র সূত্র আবিষ্কার করে ক্ষান্ত না হয়ে নূতন নূতন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে শিখলে তবেই তা ছাত্রের মনে স্থায়িত্ব লাভ করবে।

সর্বশেষ কথা—ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্ন স্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়বস্তুটিও শিশুর বুদ্ধি, সামর্থ্য ও ধারণাশক্তির স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হবে। তবেই ব্যাকরণ শিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করে ভাষাজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সাহায্য করবে, নচেৎ নয়।

অনুশীলনী

১। ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা কি? ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কি প্রণালী অবলম্বন করিবে?

(কঃ বিঃ—বি. টি. ১৯৫৫-৬০, ৬১- - ৬৭)

বানান সমস্যা

মানুষ তাহার মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করবার জন্যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে অর্থপূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করে, এবং সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ এই ধ্বনি প্রবাহ দ্বারাই অপরের সঙ্গে সব সময়ে ভাবের আদান প্রদান করে চলেছে। এই সব অর্থপূর্ণ সাঙ্কেতিক ধ্বনি প্রবাহই হল ভাষা। দেশ কাল ভেদে এই ভাব-সঙ্কেতের পার্থক্য ঘটে—নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আমরা বাঙলা দেশের অধিবাসীরা যে ধ্বনিময় সঙ্কেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি তাই হল বাংলা ভাষা একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

ভাষার দু'টি রূপ—মৌখিক ও লৈখিক। বর্তমান কাল ও সমুপস্থিত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে মৌখিক ভাষা। কিন্তু ভাষার প্রয়োজন ত সেইখানেই ফুরোয় না। অনির্দিষ্ট কাল ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও আমরা অনেক কিছু জানাতে চাই। সেইজন্যে মুখের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি প্রবাহের কতকগুলি লিখিত চিহ্ন আমরা

আবিষ্কার করেছি। এই চিহ্নগুলিকে বলি বর্ণমালা। বিভিন্ন প্রকার ধ্বনির জন্য বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণমালা ব্যবহার করে মৌখিক শব্দকে লিখিত রূপের মধ্যে ধরে রেখেছি। উচ্চারণানুরূপ কতকগুলি চিহ্ন বা বর্ণ সংযোজিত করে গঠন করা হয় এবং এই শব্দগুলিই বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক ভাব প্রকাশের উপাদান।

মানুষ সামাজিক জীব, সেই হিসাবে তার ভাষার একটা সমাজ গ্রাহ্য রূপ আছে। ভাষাকে লিখিত চিহ্নের দ্বারা স্থায়িত্ব প্রদান করতে হলে ওই চিহ্নগুলিরও একটা সমাজগ্রাহ্য ও সর্বজনবোধ্য রূপ থাকবার কথা। অর্থাৎ কোন্ কোন্ চিহ্নদ্বারা কোন্ কোন্ অর্থের শব্দকে রূপায়িত করা হবে তারও একটা নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা থাকবে। এই নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলাই হল বানানের নিয়ম। দিবস বুঝাতে যে 'দিন' লিখব তার রূপ দরিদ্র বুঝাতে যে 'দীন' লিখব তা থেকে বিভিন্ন হবার কথা। অর্থাৎ শব্দের অর্থ ও রূপের একটা সমাজ-গ্রাহ্য নিয়ম আছে, লিখবার সময় সেই নিয়মটি মেনে চললে তবেই ভাষায় বিশুদ্ধি রক্ষা হয়। এই হিসাবে বানানশুদ্ধি ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। অথচ বাংলা ভাষার বানানের বিশুদ্ধি রক্ষা করা একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাই নয়, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, এমনকি খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিরাও রচনাতে বহুল পরিমাণে বানান ভুল করে থাকেন।

ভাষার সর্বজনবোধ্য রূপ

বানান শুদ্ধি কেন প্রয়োজন

সুতরাং এই বানান ভুলের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কি কি কারণে বানান ভুল ঘটে থাকে তাই প্রথমে আলোচনা করতে হয়। তারপর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করব যে বাংলার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। সংস্কৃত তথা দেবনাগরী বর্ণমালাই বাংলার বর্ণমালা রূপে গৃহীত, অবশ্য রূপের বহিরঙ্গ দিকে নয়—উচ্চারণের অন্তরঙ্গ দিকে। সংস্কৃত বর্ণমালা একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুসজ্জিত এবং বর্ণগুলির ধ্বনিও উচ্চারণানুগ। স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা, তাছাড়া শ স ষ—ণ ন—জ য, বর্গীয় ব অন্তস্থ ব ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণেরও উচ্চারণ-পার্থক্য আছে। এই হিসাবে শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে লিখিলে সংস্কৃতে বানান ভুল হবার সম্ভাবনা কম কিন্তু বাংলার বেলায় সংস্কৃতের বর্ণগুলি সবই আমরা বহন করছি অথচ বাঙালীর জিহ্বায় তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নাই নদী ও যদি, কৃশ ও বৃষ, শব ও সব, পদ্য ও চোদ্দ একই ভাবে আমরা উচ্চারণ করি সুতরাং বানানের পার্থক্যগুলি আর শ্রুতিনির্ভর নয়, একান্তভাবেই স্মৃতিনির্ভর। তাই সেগুলি মুখস্থ করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বানান ভুলের কারণ

তাছাড়া বাংলা মিশ্রভাষা, এতে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি নানা-প্রকার শব্দের সমাবেশ। মিশ্রভাষার ধ্বনিরূপ অনিশ্চিত পরিবর্তনশীল। স্থিতিশীল বর্ণমালার দ্বারা পরিবর্তনশীল উচ্চারণকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না। দেখা ও লেখা শব্দদুটির লিখিতরূপ এক হলেও উচ্চারণ একরূপ নয়, ঘরের চাল, ডাল ও ব্যবহারের চাল, এদের মধ্যে উচ্চারণগত যে সামান্য পার্থক্যটুকু আছে লিখিত চিহ্ন দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা অনেক শব্দ আজকাল ব্যবহার করছি, যার ধ্বনিরূপ আমাদের বর্ণমালায় নেই। তাই পরশুরামকে 'Zনতি' লিখতে হয়েছে Z সাহায্যে, যদিও একই উচ্চারণের দুটা য ও জ আমরা বহন করি। মোট কথা, বাংলা বর্ণমালায় যেমন অনেক বর্ণ আছে যার উচ্চারণ নেই,আবার এমন অনেক উচ্চারণ আছে যাহার বর্ণ নেই। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। আগেই বলেছি বাংলার শব্দভাণ্ডারে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি নানা জাতের শব্দের সমাবেশ। এইগুলির বানান নিয়ন্ত্রিত হবে কোন ব্যাকরণের সূত্র দিয়ে। কর্ণ বর্ণ হবে বলে কি গভর্ণরে মুর্দ্ধণ্য-এর আধিপত্যস্বীকার করতে হবে? কার্য ও কাজের মধ্যে য ও জর পার্থক্য হল কেন? রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে "যখন শ্রবণ হইতে শোনা লিখিবার সময় ন লেখা হয়, মূর্ধণ্য ণ লিখিলে ভুল হয় তখন 'স্বর্ণ' হইতে 'সোনা' যদি না লিখি তবে ভুল হইবে কেন? এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ কেউ বর্ণমালা সংস্কার করিয়া উচ্চারণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে।"

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বাংলা ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত তৎসম তদ্ভব শব্দ নিয়ে গঠিত, নূতন শব্দগঠনেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃৎতদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের সাহায্য নিতে হয়—সেক্ষেত্রে সংস্কৃত বানান পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটলে ব্যাকরণের সাহায্যে নূতন নূতন শব্দ গঠনের বাধা ঘটবে।

বর্ণমালার সংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের কিছু কিছু সংস্কার করেছেন—পরিশেষে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল। এতে বানান অনেকক্ষেত্রে সহজ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বানান সংস্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তিনি তৎসম শব্দগুলির মাত্র সংস্কৃত বানান অবিকৃত রেখে দেশী বিদেশী তদ্ভব প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চারণানুগ সহজ বানান প্রচলন করবার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে ধুলা অথচ ধুলো, নীচ অথচ নিচু ব্যবহার করবার কথা। এর ফলে বানান সহজ না হয়ে আরো জটিল হয়েছে কিনা তা ভাববার কথা।

বর্ণমালার সংস্কার

বানান ভুলের আর একটি সর্বাপেক্ষা বড় কারণ বাংলাভাষা, তথা শুদ্ধ বানানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। ইংরাজীতে বানান ভুল করলে আমরা যতটা লজ্জিত হই, বাংলা বানান ভুলে তা হইনে। উপরন্তু বাংলা ভাষার অজ্ঞতায় যেন একটা গোপন আত্মশ্লাঘার ভাব দেখা যায়। পূর্বে এভাব যথেষ্টই ছিল, সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে তা কিছু কমেছে।

তৃতীয় কারণ বাংলা বানান শিক্ষার অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বানান সমস্যা মৌখিক ভাষার নয়, লিখিত ভাষার। অর্থাৎ কোন কথাকে যখন আমরা লিখিতরূপ দিতে চাই তখনই বানান সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বানান অভ্যাস লিখিত ভাবেই করা প্রয়োজন। তাহলে শুদ্ধ বানানের রূপটি আমাদের অবচেতন মনে মুদ্রিত হয়ে যায়, এবং লিখন কালের শুদ্ধ পৈশিক ব্যবহার অভ্যস্থ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্রেরা বানান লিখে অভ্যাস করে না, পড়ে মুখস্থ করে।

চতুর্থতঃ, যে সব শব্দের অর্থ শিশুরা জানে, সেই শব্দগুলিই তার পরিচিত এবং সেইগুলির গঠন কৌশল সম্বন্ধে তারা আগ্রহশীল। শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। শব্দ ভাণ্ডারও বাড়তে থাকে। সেই হিসাবে শিশুকে সহজ সরল পরিচিত শব্দের বানান থেকে সুরু করে ক্রমশ কঠিনতর শব্দের বানান শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রথমেই আমরা ঝঞ্ঝা, কুজ্ঝটিকা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি দুরুচ্চার্য অপ্রচলিত কঠিন শব্দের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে বানান সম্বন্ধে একটা বিভীষিকার সঞ্চার করে থাকি। বয়সের ক্রমানুসারে শিক্ষণীয় শব্দসম্ভারের কোন তালিকা বাংলাভাষায় নেই। শিক্ষক বর্ণানুক্রম অনুসারে বানান শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং এইভাবে অর্থহীন শব্দ অবলম্বনে বানান মুখস্থ করান হয় বলে ছাত্র বানান সম্বন্ধে কখনই আগ্রহান্বিত হতে পারে না।

যাইহোক বানান ভুলের স্থূল কারণগুলি মোটামুটিভাবে আলোচিত হল, তারপর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন।

বানান সমস্যার প্রতিকার

প্রথমতঃ, বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালী ছেলেদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সেকথা পূর্বেই বলেছি। বাংলাভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা একান্ত লজ্জার বিষয় বলে মনে করতে হবে। এবং এই হিসাবে বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষায় বাংলা বানানের বিশুদ্ধিরক্ষা অপরিহার্য কর্তব্য বলে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বানান শিক্ষার গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক স্মৃতি-নির্ভর পন্থা পরিত্যাগ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞান

সম্মত পন্থা অবলম্বন করতে হবে পরিশুদ্ধ লেখনকার্যে ইন্দ্রিয়শক্তি, পৈশিক শক্তি ও স্মৃতিশক্তি যুগপৎ সমবেতভাবে কার্য করে থাকে। পরে অতি-অভ্যাসের ফলে মনের অগোচরে একমাত্র পৈশিক শক্তির প্রভাবেই লিখন কার্য সমাধা হয়ে থাকে। সুতরাং বানান শিক্ষার লক্ষ্যস্থল হল স্বয়ংক্রিয় স্বল্পব্যয়ী পৈশিকশক্তির কৌশলটি আয়ত্ত করা। এই কাজটি শুধু মুখস্থ করে করা যায় না, পৈশিকশক্তি ব্যবহারেই করতে হয়—অর্থাৎ বানান লিখে অভ্যাস করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখবার প্রয়োজন। শিক্ষার মনোবিজ্ঞান অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়টির অনুশীলনে যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায়, শিক্ষা ততবেশী দ্রুত ও সফল হয়। বানান লিখবার সময়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বানান করে পড়া যায় তাহলে পেশীশক্তি, বাচনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যুগপৎ ব্যবহার করতে করতে বানান সহজে অভ্যস্ত হতে পারবে।

তৃতীয়তঃ, বয়স অনুসারে বা শিক্ষার মান অনুসারে ব্যবহৃত শব্দের একটি বিজ্ঞান-সম্মত তালিকা প্রণয়ন করতে হয় এবং সেই তালিকার শব্দ দিয়েই বানান শিক্ষা সুরু করতে হয়। যে সব শব্দ অপ্রচলিত, অব্যবহৃত, বা ছাত্রের অজ্ঞাত, সে শব্দের বানান চর্চা করে লাভ নেই।

চতুর্থতঃ, শব্দগুলি শিশুর কাছে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে না, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অবস্থাতেই আসে। এই হিসাবে প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে শিশুর মানসিক পরিমণ্ডলে বাক্যঘটিত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শব্দকে সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে দেখলে তার আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বাক্যের পটভূমিতে রেখেই শব্দের বানান চর্চা করা ভাল।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভাবন (suggestion) ক্রিয়ার প্রভাব সব সময়েই মনে রাখতে হবে। শিক্ষকের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ শিশুর মনে অত্যন্ত প্রবল অনুভাবনের কাজ করে। সেই হিসাবে শিক্ষকের বানান ভুল হলে তার ফল হবে মারাত্মক, ছাপার বইয়ের ভুলও এই দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ছাপার অক্ষরে যা বের হয় তা অমোঘ সত্য—শিশুদের পক্ষে এইরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, অথচ বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে অনবধানতা ঘটিত ছাপার ভুল এত বেশী থাকে যে, আর বলে শেষ নেই। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

পথে ঘাটে সাইনবোর্ডে কত বিচিত্র রকমের বানান ভুল তার বৃহৎ আয়তন নিয়ে দিবারাত্র ছাত্রদের মনে কত যে ভুল ছবি এঁকে দিচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

ষষ্ঠতঃ, ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার সময়ে বানানের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে

আলোচনা করতে হবে এবং পঠিত গদ্যপদ্য থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ব্যাকরণের সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। ব্যাকরণকে পাঠ্য গদ্যপদ্য থেকে স্বতন্ত্র করে যে ভাবে পড়ান হয় তাতে ছাত্রের কাছে ব্যাকরণের সূত্রগুলি কতকগুলি নীরস তত্ত্ব রূপেই দেখা দেয়, বানান নির্ধারণের তথ্য হিসাবে দেখা দেয় না। ব্যাকরণ ও সাহিত্য অনুবন্ধ প্রণালীতে (correlation of study) শিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যায়।

সপ্তমতঃ, শ্রুতিলিখনের কথা। বানান চর্চায় শ্রুতিলিখনের বিশেষ উপযোগিতা আছে। শ্রুতিলিখন অবশ্য দুই প্রকার—শিক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলক।

শিক্ষামূলক শ্রুতিলিখনে লেখা বিষয়টি প্রথমে কয়েকবার ছাত্রের কাছে পড়িয়ে শুনাতে হয়। বলাই বাহুল্য এই বিষয় বস্তুটির মধ্যে অপ্রচলিত অপব্যবহার্য কঠিন শব্দ থাকবে না। তারপর এই শব্দগুলির মধ্যে থেকে বানানের বৈশিষ্ট্য যুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। অতঃপর বোর্ডের লেখা মুছে দিয়ে ছাত্রকে শ্রুতিলিখন লিখতে দেওয়া হবে। রচনার প্রত্যেকটি শব্দ ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে হয়, কিন্তু বার বার পুনরাবৃত্তি করা ভাল নয়। শ্রুতিলিখনের পর লিখিত রচনাটি আদর্শ রচনার সঙ্গে মিলিয়ে ছাত্রের দ্বারাই সংশোধন করে নেওয়া ভাল।

শ্রুতিলিখন

পরীক্ষামূলক শ্রুতিলিখনে পূর্ব হতেই শব্দের বানান সম্বন্ধে অবহিত করে তুলবার প্রয়োজন নেই। তবে শ্রুতিলিখনের আদর্শ রচনা নির্বাচনের সময় অপুর পাঠশালার প্রসন্ন পণ্ডিত মহাশয়ের মত "জলধর পটল" সংযোগ করলে চলবে না। ছাত্রের জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই শব্দব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে।

এইভাবে প্রথম থেকেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক পন্থা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে বানান ভুলের সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে সমাধান হতে পারে, নচেৎ নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত বানান সংস্কার

আগেই বলেছি বাংলা ভাষায় পাঁচ প্রকারের শব্দ আছে—তৎসম, অর্ধতৎসম তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। তার মধ্যে একমাত্র তৎসম শব্দই সংস্কৃত অনুযায়ী বানান করা হয়। আর অন্য চার প্রকার শব্দের বানানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। এইগুলি সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন করে বানানের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা

আনবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁদের যুক্তি মতামত এবং লোকচলিত রীতির সমন্বয় করে বাংলা বানানের একটা নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন। এই নিয়মই বর্তমানে সকলে মেনে চলেছেন।

নিম্নে ওই বানানরীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

(১) রেফ ( ) সম্পর্কে—

সংস্কৃত শব্দে রেফ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জনীয়,—ধর্ম, কর্ম, সূর্য, অর্ধ (অবশ্য এটি বিকল্প নিয়ম অর্থাৎ দ্বিত্ব বর্জন না করলে যে ভুল হবে, এমন নয়) অসংস্কৃত শব্দেও রেফের পর দ্বিত্ব হবে না—সর্দার, কর্জ, পর্দা

(২) অনুস্বার (ং) সম্পর্কে—

ক খ গ ঘ ঙ পরে থাকলে সংস্কৃত শব্দে বিকল্প ম্ স্থানে ং হবে—অহংকার, সংখ্যা, সংঘ

(৩) বিসর্গ (ঃ) সম্পর্কে—

সংস্কৃত শব্দের অন্তে থাকলে তা বর্জিত হবে—যশ, মন, বক্ষ। কিন্তু শব্দের মধ্যে থাকলে বিসর্গ বজায় থাকবে এবং বিসর্গ সন্ধি অনুসারে বানান নির্ধারিত হবে—মনঃ+যোগ=মনোযোগ, যশঃ+লাভ=যশোলাভ

(৪) ই ঈ উ ঊ সম্পর্কে—

মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকলে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে ঈ ঊ বা বিকল্পে ই উ হবে—কুম্ভীর>কুমীর, চূর্ণ>চুণ, চূণ, চুণ, পক্ষী>পাখী পাখি, ঊনবিংশ>ঊনিশ উনিশ

কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই বা কেবল উ হবে। হীরক>হীরা, (হিরা নয়) দীপশলাকা>দিয়াশলাই (দীয়াশলাই নয়) চুল>চুল (চূল নয়)

স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা, পেশা ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে—ধোবানী, বাঘিনী, কাবুলী, বাঙ্গিনী, কেরানী—কিন্তু কতকগুলিতে ই-কার হবে—দিদি, ঝি, মিহি, কচি, চলতি—এ'ছাড়া প্রচলিত অ-তৎসম শব্দ মাত্রেই ই-কার দেওয়া বাঞ্ছনীয়—দুষ্টামি, ডাক্তারি, বেঙাচি, খুনটি

(৫) শ ষ স সম্পর্কে—

সংস্কৃত শব্দানুযায়ী তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে শ ষ স হবে—বংশ>বাঁশ, শস্য>শাঁস, হাস্য>হাসি, মশক>মশা, সর্ষপ>সরিষা

কিন্তু কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে মনুষ্য>মিনষে, শ্রদ্ধা - সাধ। বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুযায়ী s বা sh স্থানে শ বা স হবে - শহর, শার্ট, পোশাক, আসল, জিনিস, মসলা

(৬) জ য সম্পর্কে—

নিম্নের শব্দে 'য'র পরিবর্তে 'জ' ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। কাজ, জাঁতা, জাতি, জুঁই জো, জোড়, জোতি, জোয়াল, জুত, জো

(৭) ন ণ সম্পর্কে—

অসংস্কৃত সকল শব্দে ন হবে—কান, সোনা, বামুন, কার্নিস কিন্তু রাণী বা রানী চলতে পারে

(৮) ওকার, ঊর্ধ্বকমা সম্পর্কে—

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ ও অর্থের ভেদ বোঝাবার জন্য অতিরিক্ত ওকার ও ঊর্ধ্বকমা যথাসাধ্য বর্জনীয়। অর্থ গ্রহণে অসুবিধা হলে কয়েকটি শব্দে অন্ত্যঅক্ষরে ওকার বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্বকমা দেওয়া যেতে পারে কাল>কালো, ভাল>ভালো, মত >মতো, পড়ো>প'ড়ো

(৯) হসন্ত সম্পর্কে—

শব্দের অন্তে হস্ চিহ্ন বর্জনীয়। ক্রোধ, গর্জন, কংগ্রেস, সাবাস, সবুজ

অনুশীলনী

১। কি কি কারণে বানান ভুল হয়, বানান ভুল সংশোধনের উপায় কি? কয়েকটি ভুলের উল্লেখ কর এবং সেগুলি কিরূপে সংশোধন করিবে লিখিয়া দাও—

(ক: বি:—বি টি ১৯৫৭, ১৯৫২)

২। বানান ভুল, বাক্যবিন্যাসের ত্রুটি, অসাবধানতা,...ইত্যাদি দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবে, অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাহা বিবৃত কর।

৩। ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা রচনায় কি ধরণের বানান ভুল করে? কি কি কারণে বর্ণাশুদ্ধি হয়, ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান বিধির সংস্কার প্রচেষ্টা উল্লেখ করে প্রচলিত রীতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

রচনা শিক্ষা

রচনা শব্দটির অর্থই হল কোন কিছু নির্মাণ করা মাল্যরচনা, শয্যারচনা থেকে শুরু করে বাক্যরচনা, প্রবন্ধরচনা সব কিছুই হল বিভিন্ন উপাদানের সাঙ্গীকরণে নতুন কিছু গড়ে তোলা। এ গড়ে তোলার প্রবৃত্তি মানুষের একেবারে সহজাত মৌলিক প্রবৃত্তি।

মানব শিশু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই কত বিচিত্র উত্তেজনা তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে এসে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুলছে—অন্তরের কত বিচিত্র ভাবের উদ্ভবে অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই যোগাযোগ স্থাপনের প্রধান উপকরণই হল মানুষের ভাষা। ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার ভাব ও কর্মের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, অন্তর্লোকের সঙ্গে বহির্লোকের যোগাযোগ গড়ে তোলে। ভাষার কাজ দ্বিমুখী—একমুখে অপরের চিন্তাভাবনাকে মানুষ নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। আর এক মুখে নিজের চিন্তাধারাকে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করে। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা থেকেই রচনার উদ্ভব। রচনার মধ্য দিয়েই মানব তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা সাধারণের নিকট পরিবেশন করে।

রচনার এই ব্যাপক অর্থ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার উপায় হিসাবে এর যে একটি বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা হয় সেই অর্থেই আমরা বর্তমানে রচনা শিক্ষার পদ্ধতি আলোচনা করব।

শিশু প্রথমে কয়েকটি বিভিন্ন শব্দ শেখে। তারপর বিভিন্ন টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশ তৈরী করতে শেখে—বিভিন্ন শব্দার্থগুলি তখন বাক্যের মধ্যে ক্রমশ একটা সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে. এই হল রচনা শিক্ষার গোড়ার কথা।—শিশুর এই স্বাভাবিক প্রচেষ্টা অনুশীলনের দ্বারা আরো মার্জিত করা যায়।—শিশু গান শুনতে ভালবাসে; গল্প বলতেও তেমনি ভালবাসে।—সুতরাং গল্পবলার উপলক্ষ্য করে শিশুদের রচনাশক্তির অনুশীলন করা যেতে পারে। গল্পবলাই হল শিশুদের মৌখিক রচনা।—এর দ্বারা শিশুর কল্পনাশক্তি বা রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—

মৌখিক রচনা

এছাড়া কয়েকটি ছবি দেখিয়ে সেই ছবি অবলম্বনে গল্প রচনা করতে দেওয়া যেতে পারে। নিম্নশ্রেণীর শিশুদের এইভাবে কল্পনা শক্তি উদ্বোধিত করা ভাল।—

বড়দের বেলায় রচনাশিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও চিন্তাশক্তির

পরিমার্জনা সুন্দর ভাবে ঘটে। মনের অনেক আকাঙ্ক্ষা রচনার বক্তব্য বিষয় অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় এবং সৃষ্টিধর্মী কল্পনাবৃত্তির সার্থক অভিব্যক্তি হয়। বড়দের বেলায় মৌখিক রচনার পরিবর্তে লিখিত রচনা প্রয়োজন।—এক্ষেত্রে শুধু কল্পনাবৃত্তির নয়, সেটিকে স্থায়ীরূপ নেবার মত পৈশিক শক্তির অনুশীলনেরও প্রয়োজন। অতঃপর রচনার গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠ উপাদানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বিষয়বস্তুর কথা চিন্তনীয়। বিষয়বস্তুটি যেন যথোপযুক্ত তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং যুক্তিবিন্যাসের ধারায় যেন ভাবের পারম্পর্য অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় কথা, রচনার বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখতে হয়, কোনও একদিকে পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে রচনার সৌন্দর্যের হানি ঘটে। তারপর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে —রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষা নির্বাচন। রচনার বিষয়বস্তু যাই হোক, সহজ সরল সাবলীল ভাষার টানে অনেক দুরূহ বিষয় সর্বজনবোধ্য হয়ে ওঠে।

রচনা শক্তির অনুশীলনী

শেষকথা—রচনার প্রাঞ্জলতা সরলতা এবং আনুপূর্বিক একটা সঙ্গতিপূর্ণ রচনাশৈলী থাকা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"রচনার প্রথম গুণ ও প্রথম প্রয়োজন, সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বোঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা। তাহার পর ভাষার সরলতার ও স্পষ্টতার সঙ্গে সৌন্দর্য মিশাইতে হুইবে।—"

এইবার রচনার দোষ ত্রুটির কথা।—দোষকে দুদিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে—এক, বিষয়বস্তু ঘটিত এবং অপর, ভাষা ও রচনা-শৈলী ঘটিত। এই দুটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান অর্জন না করেই ছেলেরা আবোলতাবোল যা তা লিখে যায়। কখনও বা রচনা-পুস্তক থেকে কতকগুলি সত্য-মিথ্যা তথ্য না বুঝে গলাধঃকরণ করে রচনায় বসিয়ে যায়,—তার ফলে রচনা হয়ে ওঠে একেবারেই অর্থহীন কৃত্রিম ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।

রচনার দোষত্রুটি

রচনাশৈলীর ত্রুটি আরো মারাত্মক—প্রধানতঃ বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণঘটিত ভুলের ফলে রচনা প্রায়ই অপাঠ্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং রচনা লেখা অভ্যাস করতে হলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে—

প্রথমতঃ, যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে সে সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সেটুকু আগেই ভাল করে জেনে নিতে হবে, সমস্ত কিছুই নিজের অভিজ্ঞতায় থাকবার কথা নয়।

বই থেকে পড়ে তারপর সেগুলি নিজে বেশ করে চিন্তা করে বুঝে নিয়ে অবশেষে রচনা লিখবার জন্য তৈরী হতে হয়।

শিক্ষক মহাশয়ও শ্রেণীতে কোনও রচনা লিখতে দিলে তিনি সে সম্বন্ধে শ্রেণীতে আলোচনা করবেন এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় সঙ্কেত নির্দেশ করবেন। প্রয়োজন হলে

রচনা লেখার পদ্ধতি

২।১ খানি পুস্তকের অংশ বিশেষের কথা উল্লেখ করবেন, যা থেকে ছাত্ররা নিজেরাই প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এইভাবে রচনার মালমসলাগুলি সংগৃহীত হলে পরে সেগুলিকে এমনভাবে গুছিয়ে সাজাতে হবে যাতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা থাকে—এলো মেলো না হয়ে যায়। সেই জন্য সমস্ত বিষয়টি কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের জন্য এক একটি গূঢ় সঙ্কেত (point) ভেবে নিতে হয়, পরে সেই সঙ্কেতগুলিকে বাড়িয়ে লিখলেই রচনাটি সম্পূর্ণ হতে পারবে। সঙ্কেত বাড়ানোর সুবিধার জন্য প্রত্যেক সঙ্কেতের কতকগুলি প্রশ্ন করা যেতে পারে। ঐ প্রশ্নের উত্তর থেকেই রচনার বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে।

অনুচ্ছেদ সাজানোর মধ্যেও কিছু চিন্তা করতে হয়। যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি প্রথম দিকে বলাই ভাল। শেষাংশে নিজস্ব মতামত বা মন্তব্য কিছু বলতে হয়। মাঝখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে সাজাতে হয়।

এই হল বিষয়বস্তুর কথা—এরপর ভাষাশৈলীর কথা। ভাষা ও রচনা ভঙ্গীর ত্রুটিই হল সবচেয়ে মারাত্মক। বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণগত ভুলের জন্ত রচনা প্রায়ই অপাঠ্য হয়ে ওঠে। রচনা লিখবার সময়ে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার।

নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের কঠিন বা জটিল বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে দিতে হয় না—এবং তাদের ভাষাও সহজ সরল হওয়াই স্বাভাবিক। মনের ভাবটি ছোট ছোট বাক্যে প্রকাশ করতে হয়, বড় বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করলে ভাল। ছাত্রদের অনেক সময় গালভরা কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে রচনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। তার ফলে গুরুচণ্ডালী দোষ ত হয়ই। কখন কখন শব্দের হাস্তকর অপপ্রয়োগও দেখা যায়।

অনেকে রচনাটি প্রথমদিকে রীতিমত গুরুগম্ভীর ভাষায় আরম্ভ করে আর শেষ রাখতে পারে না--তার ফলে রচনাটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

রচনার আর এক বড় ত্রুটি সাধুভাষায় ও চলিত ভাষার অবাধ মিশ্রণ। সাধুভাষায় রচনা ভাল, চলিত ভাষায় রচনাও আজকাল সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে—রচনায় যে কোন একটি বেছে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু দুয়ের মিশ্রণ হয়ে গেলেই রচনাটি নষ্ট

হয়ে গেল। চলিত ও সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চলিত ভাষায় আগাগোড়া সমানভাবে রচনা করা সহজ নয়, —বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ। সেজন্য প্রথম প্রথম সাধু ভাষায় রচনা লিখতে অভ্যাস করাই ভাল।

অনুশীলনী

১। রচনা সুন্দর করিয়া লিখিতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবে তাহা লিখ—

(কঃ বঃ—বি. টি,—১৯৪৯)

২। রচনা শিখাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তোমার যাহা মনে হয় তাহা বিশদভাবে লিখ—

(কঃ বিঃ—বি, টি,—১৯৫১)

৩। ভাষা শিক্ষা এবং রসবোধের পক্ষে রচনাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর রচনার লক্ষণ কি তৎসম্পর্কে আলোচনা কর— (কঃ বিঃ—বি, টি,—১৯৫৯)

৪। মৌখিক রচনার স্থান বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে আছে কি? রচনা শিক্ষাদান কালে মৌখিক লিখিত কার্যের সম্পূর্ণ বিচার কর—

৫। ভাষা শিক্ষা ও রসবোধের পক্ষে রচনা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি? রচনা লিখন শিক্ষা দেবার উৎকৃষ্ট প্রণালী কি?

অনুবাদ শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুখে যত বড় বড় কথাই বলি সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিল ইংরাজের অফিসে সুদক্ষ কেরাণী তৈরী করা এবং শিক্ষার সমগ্র কাঠামোটাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার মধ্যে দিয়ে ইংরাজী শেখানোর প্রচেষ্টাই সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বাহন ছিল ইংরাজী, সুতরাং ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি যাই শিক্ষা দেওয়া হোক সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হয়ে যেত এবং ইংরাজী ভাষায় ভাল রকম দখল না হলে ঐ সকল বিষয়ের রসাস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হত না।

অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-অতীতে

বিপদ হল বাংলাকে নিয়ে। বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে ত ইংরাজী মাধ্যম অবলম্বন করা যায় না, সম্ভবতঃ তাই অনুবাদ শিক্ষার শরণ নেওয়া হল। ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ বাংলা শিক্ষার অনেকখানি স্থান জুড়ে রইল। কিন্তু অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কি বাংলা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাই? প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে দখল না থাকলে অনুবাদ করা যায় না। ইংরাজী শব্দার্থ, চলিত বাগভঙ্গী প্রকাশ কৌশলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান থাকলে তবেই অনুবাদ করা যায়। সুতরাং অনুবাদ শিক্ষা বাংলা ভাষা শিক্ষার যতটা সাহায্য করে তার চেয়ে অনেক বেশী করে ইংরাজী শিক্ষার। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে অনুবাদ শিক্ষাকে মাতৃভাষা শিক্ষার অঙ্গীভূত করে রাখবার কোন হেতু নেই।

কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দেখলে অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। অনুবাদের মধ্যে দিয়েই এক দেশের ভাবসম্পদ অন্য দেশের ভাণ্ডারে এসে জমা হয়, ভাণ্ডার ভরে ওঠে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যা কিছু মূল্যবান কথা কেউ বলে গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মনন ক্ষেত্রে আমদানি করতে হলে অনুবাদের তরণী বেয়েই তাদের আনতে হবে। তাতে দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। মাতৃভাষায় দেশবাসীর শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, দেশের সাহিত্যও শ্রীমণ্ডিত হবে। এইদিক দিয়ে ইংরাজী ভাষার ও সাহিত্যের তুলনা নাই। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের ভাবধারা অনুবাদের খাত বেয়ে আজ ইংরাজী সাহিত্যের মহাসাগরে এসে মিলিত হয়েছে। আমরা বাঙালীরা সেই মহাসাগরের কয়েক অঞ্জলি জলপান করেই বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি,

বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু বর্তমানে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার সার্বভৌমত্ব আর আমরা স্বীকার করিনে। মাতৃভাষা তার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে আত্মমর্যাদার গৌরবময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন এই আমাদের কামনা। সুতরাং পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিচয় মাতৃভাষার মধ্যেই যাতে পাওয়া যায়, অনতিবিলম্বেই তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এই দিক দিয়ে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে অনুবাদ কার্যের একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। বিদেশী সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য, রচনা কৌশল ও কলাশৈলী অনুবাদের মধ্য দিয়ে যথোচিত পরিমাণে উপভোগ করতে গেলে সেই অনুবাদ কার্যও রসোত্তীর্ণ শিল্পকলা হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। অনুবাদ সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন সাহিত্যের রসবস্তু অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকার মত, একভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্যভাষার অন্তঃপুরে আনতে গেলে স্বভাবতই তার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যায়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। লজ্জাটি যিনি যে পরিমাণে ভাঙিয়ে রসের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেন তিনি সেই পরিমাণে সার্থক অনুবাদক। সুতরাং এই অনুবাদ কার্য একটি শিল্প কলা এবং বলাই বাহুল্য তা' যথোচিত পরিমাণে চর্চা-সাপেক্ষ। সাহিত্যের রসপুষ্টি ছাড়া জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অনুবাদের সার্থকতা বড় কম নয়। বাংলা সংবাদপত্র-অফিসে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা জানেন দেশ-বিদেশ থেকে আজও ইংরাজী, হিন্দী ও বিভিন্ন ভাষায় যে সব বক্তৃতা ও আলোচনাদি চলছে, বাংলা ভাষায় তার দ্রুত রূপান্তর করে ফেলবার প্রয়োজনীয়তা থেকেও অনুবাদ কার্যের গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করতে পারব।

অনুবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বর্তমানে

এই সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে অনুবাদ শিক্ষার আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করতে পারব না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যেই অনুবাদ শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকবার প্রয়োজন।

এখন এই অনুবাদ শিক্ষাদান কার্য কিভাবে পরিচালিত হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যটি সহজে সফল হতে পারে সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ—কোন সময় থেকে তা সুরু করা যেতে পারে তাই বিবেচ্য। ছাত্র যখন ইংরাজী পাঠে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, প্রচলিত ইংরাজী শব্দের মোটামুটি অর্থ শিখেছে এবং ইংরাজী বাক্য গঠনের কৌশল সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা হয়েছে, সেই সময়েই অনুবাদ শিক্ষার কাজ সুরু হতে পারে।

তারপর, ছাত্রের ইংরাজী ভাষা জ্ঞানের পরিধি যতটুকু, অনুবাদকে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। অর্থাৎ পূর্বার্জিত ইংরাজী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই অনুবাদ কার্য সুরু হবে। ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করে এই কার্য সহজে করা যেতে পারে। তারপর অনুবাদের কৌশল কিছু পরিমাণে অধিগত হলে অন্য পুস্তক থেকে বা ওই ধরণের সহজ ইংরাজী রচনার অংশ বিশেষ থেকে অনুবাদ করতে দেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজন হলে কঠিন ইংরাজী শব্দগুলির অর্থ বলে দেওয়া বা বোর্ডে লিখে দেওয়া ভাল। ইংরাজী বাগধারা (idiom) ইত্যাদির প্রতি প্রয়োজন থাকলে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদনুরূপ বাংলা বাগধারা কি হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

এইভাবে অনুবাদ কার্যের কাঠামো গঠন শিক্ষা ভালভাবে পোক্ত হলে তাকে কিছু রস-সম্পৃক্ত করে তুলতে শিক্ষা দিতে হবে। আদর্শ অনুবাদ অর্থে কেবলমাত্র অর্থান্তর করা নয়, তার মধ্যে সাহিত্যরস সঞ্চার করে তাকে একেবারে সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত করা। এই কার্যের জন্য ভালভাল সাহিত্যরস-সম্পৃক্ত আদর্শ অনুবাদের অংশবিশেষ ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনান প্রয়োজন, এবং উভয় ভাষার বাক্য-গঠনগত পার্থক্য ও বাগধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছাত্রদের অবহিত করে তুলবার প্রয়োজন। আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও রসানুবাদ কোনটা কি ভাবে করতে হয় দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনুবাদ যতটা মূলানুরূপ ততই ভাল, তবে অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদে রচনা একান্তই কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট, এমনকি অর্থহীন হয়ে পড়ে—সেক্ষেত্রে সরল স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ করাই বাঞ্ছনীয়। অনুবাদ কার্য কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে বিচার করতে হলে অনূদিত বিষয়টি স্বতন্ত্র-ভাবে পড়ে দেখতে হয়, তাতে বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুবাদের মধ্যে কতটুকু ফুটে উঠেছে তা বুঝতে পারা যায়।

শ্রেণীতে পাঠদানকালে অনুবাদ শিক্ষার কার্য কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্বন্ধে একটা পাঠটীকা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

অনুবাদ শিক্ষার পদ্ধতি

প্রথমতঃ, আয়োজন পর্যায়ে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে নিতে হবে। ইতিপূর্বে কোন্ মান পর্যন্ত অনুবাদ কার্য ছাত্র করেছে তা না জানলে নূতন পাঠ কোন মান অনুযায়ী হবে তা বুঝতে পারা যাবে না।

তারপর অনুবাদের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছোটখাট একটু ভূমিকা করবার প্রয়োজন। বক্তব্য বিষয়ের একটু মোটামুটি ধারণা পূর্ব থেকেই থাকলে বিষয়বস্তুর মর্ম

গ্রহণ করা সহজ হয় এবং তাতে অনুবাদ-রচনাটি রস-সম্পৃক্ত করা যায়। দু'একটি শব্দের অর্থ জানা না থাকলেও বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় সোপানে অর্থাৎ উপস্থাপন পর্যায়ে অনুবাদের মূল বিষয়বস্তুটি শিক্ষক ধীরে ধীরে সরব-পাঠ দিবেন। তারপর প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের অন্তর্গত দুরূহ শব্দ, অভিনব বাকভঙ্গী ও বিচিত্র বাগধারার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কোন কোন অংশে শাব্দিক অনুবাদ অর্থহীন হয় এবং সেখানে কেমন করে ভাবানুবাদ করতে হয় সে সম্বন্ধে ছাত্রদের লক্ষ্য করতে বলবেন।

তৃতীয় সোপানে অর্থাৎ অভিযোজন পর্যায়ে গিয়ে ছাত্র বিষয়টির অনুবাদ করবে।

এইভাবে অগ্রসর হলে অনুবাদ কার্যের কৌশলটি ছাত্রেরা সহজেই শিখতে পারবে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি আদর্শ অনুবাদ দৃষ্টান্তস্বরূপ পড়ে শোনালে ভাল হয়। তাহলে অনুবাদ রচনাকেও যে কতখানি রসোত্তীর্ণ করা যায় সে সম্বন্ধে ছাত্রেরা অবহিত হবে।

অনুশীলনী

১। ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ করিতে ছাত্র ছাত্রীদের শিখান হয়। ইহার দোষগুণ আলোচনা কর। (কঃ বিঃ—বি. টি.,—১৯৬৭)

২। ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অনুবাদ শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদের উৎকৃষ্ট প্রণালীটি দেখাইয়া দাও। (কঃ বিঃ—বি টি—১৯৫২)

৩। ভাষাশিক্ষায় অনুবাদ শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি? বঙ্গানুবাদ যাহাতে নির্দোষ হয় তাহা শিখাইবার জন্য কি কি নির্দেশ দিবে? (কঃ বিঃ বি টি—১৯৫৪)

৪। শিক্ষার দিক দিয়া ভাষা ও সাহিত্য পড়াইবার সময়ে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা কি? যদি প্রয়োজন থাকে তবে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে? (কঃ বিঃ—বি টি—১৯৫৮)

ছন্দ

জগৎ ছন্দময়। নক্ষত্র সূর্যাদি মহতোমহীয়ান থেকে সুরু করে অনোরনীয়ান পরমাণু পর্যন্ত সব কিছু ছন্দে ছন্দে আবর্তিত। মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাস রক্তসঞ্চালন হৃদস্পন্দন সবই চলেছে ছন্দের তালে তালে। কি বস্তুজগতে কি ভাবজগতে সর্বত্রই মানুষের বিকাশ ছন্দময়। তাই মানব জীবনের সকল মাধুর্য সকল সৌন্দর্য সকল আনন্দ পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, যখন সে থাকে স্বচ্ছন্দে। সৃষ্টির কোন আদিকালে প্রথম জীবকোষটি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হতে হতে তার জীবন পরিক্রমা শুরু করেছিল। তারপর কত যুগযুগান্ত ধরে বিচিত্র জীবকোষটি পরিভ্রমণ করে আজ সে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে—কিন্তু এখনো তার দেহের প্রতিটি জীবকোষে সেই অতীত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অসীম আনন্দ। ছন্দের প্রতি মানুষের তাই স্বাভাবিক আকর্ষণ, ছন্দের মাধ্যমে মানুষের আনন্দোচ্ছ্বাস।

প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে, তাতে তার দৈনন্দিন কাজকারবার চলে, কিন্তু আনন্দের তাগিদে শিল্পী মানুষ সেই ভাষায় ছন্দোযোগ করেছে তাতে তার আনন্দময় সত্তার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাজের মানুষ ঘট তৈরী করে জল খাবার জন্য, শিল্পী মানুষ তার গায়ে নকশা আঁকে আনন্দলাভের জন্য। অর্থ দিয়ে ঘেরা কথার বন্ধন শিথিল করে ভাবের মুক্তি দেয় এই ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—"আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে গাঁথা। কিন্তু এ কেবল বাইরের বাঁধন অন্তরের মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দে ছন্দে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে স ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে—" মুখের কথা ছন্দের সাহায্যে মর্মের কথা হয়ে ওঠে।

এইজন্য কাজের ভাষাকে মানুষ যখনই আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে তখনই তার প্রকাশ ঘটেছে ছন্দবদ্ধ কবিতায়। শিশু প্রথম কথা বলতে শিখেই দুলে দুলে ছড়া অবৃত্তি করে। শিশু দেবতার প্রতি বিমুগ্ধ মাতৃহৃদয়ের প্রথম স্তবগান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ছেলেভুলান ছড়ায়। ছড়ার ছন্দবৈচিত্র্য ও ধ্বনিসুষমাই প্রধান হয়ে শিশুচিত্তকে অভিভূত করে দেয়। অর্থ সেখানে একেবারেই অনর্থক। ছন্দের ঝঙ্কারেই শিশু পুলকিত হয়ে ওঠে।

ছন্দের স্থান।

বিচিত্র শব্দপুঞ্জের পরিমিত আবর্তনের হিল্লোলে শিশুর সমগ্র দেহমনে একটা দৈব আনন্দ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ছন্দ ও অর্থ মিলে হয়

কবিতা, তার মধ্যে ছন্দের আবেদন দেহগত জৈব আনন্দের কাছে, আর অর্থের আবেদন ভাবগত বৌদ্ধ আনন্দের কাছে, সুতরাং শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছন্দের প্রতি, পরিমিত পদবিন্যাসের হিল্লোলের প্রতি। কবিতার সহজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি ব্যঞ্জনাময় সরব পাঠে অর্থাৎ সুষ্ঠু আবৃত্তির ফলে কাব্যের ভাষায় যে একটি নৃত্যপর সঙ্গীতমধুর তরঙ্গময় প্রবাহের সৃষ্টি হয় তারই উচ্ছ্বাসে শ্রোতার সমগ্র দেহমন আনন্দপ্লুত হয়ে ওঠে।

সুতরাং ছন্দের এই স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির কথা স্মরণ রেখে বিদ্যালয়ে কবিতা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হয়। সমস্ত কবিতাই যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা ছেলেদের বুদ্ধিগোচর করে তুলতে হবে, মানে কি কথা আছে? ছন্দহিল্লোলের আনন্দদানও অনেকক্ষেত্রে কবিতা পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঝর্ণা কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি। কবিতাটি অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের এমন সব শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উৎকলিত হতে দেখা যায় যাদের পক্ষে এই কবিতার অর্থবোধ সম্ভব নয়। কিন্তু ছন্দ ঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার উপলব্যথিত গতিপ্রবাহটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সেটা কিন্তু অনুভব করতে পারে সকল শ্রেণীর ছেলেই। এখানেই হল ছন্দের যাদু।

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে····ইত্যাদি

কবিতাটির প্রত্যেক শব্দের অর্থ শিশু তন্ন তন্ন করে না বুঝলেও এর ছন্দ তার প্রাণে দোলা দেয় এবং আবছা যা বুঝবে কাব্যরস সঞ্চারের পক্ষে তাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিস নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নয়। প্রাণের মধ্যে ঘা' দেওয়া—" এই ঘা দেওয়ার কাজে ছন্দের দোলা সবচেয়ে কার্যকরী।

ছন্দের এই প্রচণ্ড আনন্দ-মধুর আকর্ষণীয় শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয় নিশ্চয়ই অবহিত হবেন। এই শক্তির উৎস কোথায়, কি বিচিত্র এর অভিব্যক্তি, কি মধুর এর আবেদন সমস্তই সম্পূর্ণ ভাবে না জানা থাকলে কবিতা পাঠের দ্বারা শিক্ষক মহাশয় কখনই আশানুরূপ আনন্দ সঞ্চার করতে পারবেন না।

শিক্ষকের ছন্দ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং বাংলা ভাষার শিক্ষককে বাংলা ছন্দ বিজ্ঞানের মূলসূত্র ভাল করে জেনে রাখতে হবে। কত বিচিত্র ধরণের পদ বিন্যাস, ছেদ বিন্যাস ও শ্বাসাঘাত জনিত ধ্বনিতরঙ্গ বাংলায় কত নূতন নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেছে, কি তাদের লক্ষণ, কোথায়

তাদের সৌন্দর্য, কোনখানে তাদের বৈশিষ্ট্য এই সমস্ত জানা থাকলে তবেই শ্রেণীকক্ষে কবিতার রস সঞ্চারী পাঠদান করা সম্ভব। বলাই বাহুল্য ছন্দ বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য নয় সুতরাং শিক্ষক ছন্দ চর্চা করবেন ছাত্রকে ছন্দবিজ্ঞান বোঝানোর জন্য নয়, ছন্দের গীতিমাধুর্য উপভোগ করানর জন্য। কবিতা পঠন-পাঠনের জন্য তাই ছন্দবিজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য।

ছন্দ লিপিগ্রাহ্য নয়, শ্রুতিগ্রাহ্য অর্থাৎ ছন্দের বিচার লেখা দেখে নয়, পড়া শুনে। শব্দের উচ্চারণভঙ্গীর উপর নির্ভর করে ছন্দবৈচিত্র্য। অথচ বাংলা বর্ণ উচ্চারণের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। প্রয়োজনমত এবং ইচ্ছামত বাংলার বর্ণ হ্রস্ব বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে দেখলে বাংলার ছন্দবিচার জটিল। বাংলাভাষার

ছন্দবিচার

ছান্দসিকদের মধ্যে তাই মতভেদেরও অন্ত নেই। বর্তমান প্রবন্ধে ছন্দ বিচারের সেই জটিলত্ব আলোচনা করবার সময় বা সুযোগ নেই। ছন্দবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র পুস্তক থেকে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে পারেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে ছন্দ বিচারের মূলসূত্র সম্বন্ধে কয়েকটি মোটাকথা আলোচনা করেই আমাদের ক্ষান্ত হতে হবে।

আগেই বলেছি, ছন্দ হচ্ছে পরিমিত শব্দবিন্যাসউদ্ভূত ধ্বনি হিল্লোল। কিন্তু এই পরিমিতি কিসের উপর নির্ভরশীল ?

বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ করলে উপাদান হিসাবে দেখা যাবে অক্ষর মাত্রা, পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি ··

অক্ষর বলতে সাধারণতঃ আমরা তা' বর্ণের সঙ্গে অভিন্নার্থ বলে মনে করি, কিন্তু ছন্দ বিচারে অক্ষর হল উচ্চারণ-সাধ্য সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ধ্বনি অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে সিলেবল্ (Syllable) যেমন 'চন্দনে' দুটো অক্ষর চন্ দন্। অক্ষর স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত দুই-ই হতে পারে, যথা জান্‌লা। জান্ ব্যঞ্জনান্ত এবং লা স্বরান্ত।

মাত্রা হচ্ছে উচ্চারণের সময়ের মাপ। একটা অক্ষর উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকুই হচ্ছে একমাত্রা। সংস্কৃত বা বাংলায় কোন কোন ছন্দ বিচারে হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুইমাত্রা বলে ধরা হয়। কিন্তু বাংলার স্বরবর্ণ হ্রস্বদীর্ঘ মেপে উচ্চারিত হয় না, তাই বাংলার ছন্দ এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। 'দেশ দেশ নন্দিত করি'র' "দে" এবং 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে'র "দে" সমান মাত্রার নয়। অথচ নদী ও যদির শেষ অক্ষরটি হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে একমাত্রার। এর ফলেই বাংলা কবিতার ছন্দ বিজ্ঞান জটিল হয়ে উঠেছে।

এরপর **যতির** কথা। আমরা কখনই একটানা কথা বলতে পারি না, শ্বাসগ্রহণের

জন্য মাঝে মাঝে থামতেই হয়। বাক্যের মধ্যে এই বিরতির নাম হল যতি। গদ্যে এই যতির কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই, কিন্তু পদ্যের বেলায় সুনির্দিষ্ট অক্ষরের পর শ্বাসবায়ুর বিরাম হবেই। এই সুনিয়মিত যতির ফলেই ছন্দের ওঠানামা, ছন্দের তরঙ্গ। যতি সব সময়ে সমান মাপের হয় না। বিবাম কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী যতি সাধারণতঃ তিন প্রকার হতে পারে—

(ক) **দীর্ঘ যতি বা ছেদ**—দীর্ঘতম বিরাম। কবিতার চরণের শেষে বা গদ্যের বাক্যের শেষে ছেদ চিহ্ন বা দীর্ঘ যতি পড়ে।

(খ) **পূর্ণ যতি**—অপেক্ষাকৃত কম বিরাম। কবিতায় ছন্দ-পর্বের শেষে এবং গদ্যে অর্থ-পর্বের শেষে পূর্ণ যতি পড়ে।

(গ) **অর্ধযতি**—স্বল্পবিরাম। ছন্দের খাতিরে অনেক সময় পর্বের মধ্যেও স্বল্পকালীন বিরাম দিয়ে পড়তে হয়, এই খণ্ডিত পর্বের নাম পর্বাঙ্গ। এই যতি বা বিরতি দুই কারণে ঘটে—এক অর্থানুসারে, আরেক ছন্দানুসারে। অর্থানুসারে থামলে তাকে বলা যায় অর্ধযতি বা ভাবযতি এবং অপরটি ছন্দযতি।

বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য

যথা— কবে পড়িবে বেলা | ফুরাবে সব খেলা।
নিবাবে সব জ্বালা | শীতল জল ॥

এখানে ভাবযতি ও ছন্দযতি একই সঙ্গে পড়েছে

অথচ—ঘরেতে দু | বস্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি—

এখানে ছন্দযতির সঙ্গে যে ভাবযতির মিল নাই তা ত দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

পর্ব—

একটি ছন্দ পংক্তিকে যতি দ্বারা খণ্ডিত করলে এক একটি খণ্ডকে বলা হয় পর্ব, অর্থাৎ কবিতা পড়বার সময় এক ঝোঁক থেকে আরেক ঝোঁক অবধি যে অংশটুকু থাকে, তাই হল পর্ব। যতি কবিতার ধ্বনিপ্রবাহকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমিতি দান করে, এবং সেই পরিমিত খণ্ডই হল পর্ব।

| | | | | | | | | | | | | |
কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে। কহে বেদব্যাস ॥ ৮+৬
| | | | | | | | | | | | | |
চৈতন্য লীলায় ব্যাস। বৃন্দাবন দাস ॥ ৮+৬

এখানে প্রত্যেক চরণে দুটি করে পর্ব। প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা ও দ্বিতীয়

পর্বে ৬ মাত্রা। ৮ মাত্রার পর্বটি আবার দুটি করে চার মাত্রার-খণ্ডে ভাঙা যায় (কৃষ্ণলীলা। ভাগবতে॥ চৈতন্য লী। লায় ব্যাস।) এই খণ্ড পর্বগুলিকে পর্বাঙ্গ বলা যায়।

বাংলা কবিতায় সাধারণতঃ চার থেকে দশ মাত্রার পর্ব দেখা যায়। অনেক সময় শেষ পর্বটির মাত্রা সঙ্কোচ ঘটে। যেমন—

"শুধু বিঘে দুই। ছিল মোর ভুঁই। আর সবি গেছে। ঋণে"—প্রত্যেক পর্ব ছয় মাত্রার অথচ শেষ পর্ব 'ঋণে' মাত্র দু মাত্রার। একে বলে "অপূর্ণ পদী পর্ব" অর্থাৎ অপূর্ণপদী পর্ব হচ্ছে পূর্ণপদী পর্বের তুলনায় ছোট বা সঙ্কুচিত।

এছাড়া, অনেক সময় কবিতার চরণের প্রারম্ভে আর এক প্রকার বাড়তি ধ্বনি গুচ্ছ থাকে, তাকে বলব 'অতিপার্বিক ধ্বনি'। এটা যেন একটা বাড়তি পর্বাঙ্গ। যেমন—

(দেখো) হতে পার্তেম | নিশ্চয় একটা | উঁচুদরের | কবি
(কিন্তু) লিখতে বসলে | অক্ষর গুলো | গরমিল হয় যে | সবই

চরণ—

পূর্ণ যতির দ্বারা সীমিত কয়েকটি পর্বসমষ্টিই হল চরণ। এখানে ভাবের দিক থেকে ধ্বনির গতি পূর্ণ বিরতি লাভ করে।

। । । । । । । । । । । । । ।
পাখী সব | করে রব | রাতি পোহা | ইল

এই একটি চরণ। পর্বগুলি চার মাত্রার, শেষেরটি দুই মাত্রার অপূর্ণপর্ব। এক একটি চরণ সাধারণতঃ দুই, তিন, চার এমনকি পাঁচ পর্বের দ্বারা গঠিত হয়। এক একটি পর্বে আবার চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা দশ মাত্রা থাকে—যথা—

দ্বি পার্বিক চরণ—(৮ × ৬) মাত্রা

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান ॥

ত্রি পার্বিক চরণ (৮+৮+৬)

নদী তীরে বৃন্দাবনে | সনাতন এক মনে | জপিছেন নাম ॥

চতুঃ পার্বিক চরণ—(৬+৬+৬+৫)

চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে ॥

পঞ্চ পার্বিক চরণ—(৫+৫+৫+৫+২)

সকাল বেলায় | ভাতের থালা | সন্ধ্যা বেলায় | রুটি কিম্বা | লুচি ॥

স্তবক—

দুই বা ততোধিক চরণ সুশৃঙ্খলভাবে একত্র সন্নিবেশিত হলে তাকে চরণগুচ্ছ বা স্তবক বলা যায়। আজকাল বাংলা কবিতায় বহু বিচিত্র ধরণের স্তবক বিন্যাস দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ—

মাত্রা গণনার বৈচিত্র্যের উপরই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য। আগেই বলেছি বাংলা অক্ষরের মাত্রা পরিবর্তনশীল, তাই মাত্রা গণনার পদ্ধতিটাও নানারকমের। এই থেকে নানা জাতের বাংলা ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে।

ছন্দ বিজ্ঞানীরা বাংলা কবিতার বিচিত্র ছন্দ সজ্জা পরীক্ষা করে উচ্চারণ ভঙ্গীর দিক থেকে তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

নিম্নলিখিত তিনটি ছত্র পরীক্ষা করে দেখা যাক—

॥ । ।। । ॥ । ॥ । ॥ ।। ।। ॥ ।

(ক) আসিল যত | বীর বৃন্দ | আসন তব | ঘেরি ॥

৬+৬+৬+৩

[দীর্ঘস্বর ও হসন্ত অক্ষর দু'মাত্রা, বাকি একমাত্রা]

। । । । । । ।। ।।। ।।।

(খ) আসিল বীরের দল | আসন ঘেরিয়া ॥ ৮+৬

[হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে প্রত্যেক অক্ষর একমাত্রা]

। । ।। ।।। । । । ।।

(গ) আসল যত | বীরের চমু | আসন তোমার | ঘেরি।

৪+৪+৪+২

[হসন্ত অক্ষর একমাত্রা]

স্বরান্ত ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের উচ্চারণ পার্থক্য হেতু উপরোক্ত তিনটি ছত্রের পর্বের মাত্রা-সংখ্যা বদলে গিয়েছে অর্থাৎ ছন্দ সৃষ্টির মৌলিক উপাদানের বদল ঘটেছে। সুতরাং ছন্দ বিচারে এই তিনটি ঢং তিনটি স্বতন্ত্র জাতের বলে মনে করা হয়েছে এবং উচ্চারণ ভঙ্গীর দিক দিয়ে এদের স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়েছে (১) ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (২) তান-প্রধান বা অক্ষর বৃত্ত ছন্দ (৩) শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলবৃত্ত ছন্দ। অবশ্য নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে যথেষ্ট তবু এই তিনটে নামই প্রচলিত বেশী। এইবার এক এক করে এই তিনটির মৌলিক লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করি—

(১) ধ্বনি-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ—

এ ছন্দের নানা নাম—ধ্বনিমাত্রিক, মধ্য লয়ের ছন্দ, পদ ছন্দ, তৎসম ছন্দ, ইত্যাদি—

এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে

(i) বর্ণের ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ যথাসম্ভব সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী এবং সেই অনুযায়ী মাত্রা গণনা, ক—ছত্রের মাত্রা গণনা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। এইজন্য এই ছন্দের নাম ধ্বনি মাত্রিক।

(ii) পর্বগুলিতে চার, পাঁচ, ছয়, সাত অথবা আট মাত্রা থাকে।

(iii) এই ছন্দে লয় দ্রুতও নয় আবার ঢিমাও নয়, মধ্যম রকমের গতিতে পর্বগুলি উচ্চারিত হয়। এইজন্য এই ছন্দের নাম মধ্যলয়ের ছন্দ।

(iv) সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর প্রত্যেকটি অক্ষরের ধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয়। আগেই বলেছি স্বরবর্ণের মাত্রা সংস্কৃতরীতি অনুযায়ী। যুক্ত ব্যঞ্জনের ঠিক আগের স্বরধ্বনিকে দুমাত্রার ধরতে হবে। হসন্ত অক্ষরের ও যৌগিক অক্ষরের স্বর ধরতে হবে দু'মাত্রা, অনুস্বর বিসর্গের আগের স্বরবর্ণও দীর্ঘ হবে। বাকী সব একমাত্রার। যথা—

ǁ । । । | ǁ । । । | ǁ । । । | ǁ । ǁ
(১) নন্দপুর | চন্দ্রবিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার ৫+৫+৫+৫

। । । ǁ | । । । । । | । । । । । | ǁ । । ǁ
চলে না চল | মলয়ানিল | বহিয়া ফুল | গন্ধভার ৫+৫+৫+৫

ǁ । । ǁ । । | । । । । । । । ।
(২) কণ্টক গাড়ি ক | মল সম পদতল ৮+৮+৮+৩

ǁ । । | ǁ । । | ǁ ।
মঞ্জির | চীরহি | ঝাঁপি

ǁ । । । | ǁ । । । | । । । । । | ǁ । ।
(৩) পঞ্চশরে | দগ্ধকরে | করছ একি | সন্ন্যাসী ৫+৫+৫+৫

এই ছন্দে, সাধারণতঃ সংস্কৃত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা হয়। তাই এর এক নাম তৎসম ছন্দ। সুতরাং সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের অনুকরণে বাংলায় যে সব ছন্দ তৈরী হয়েছে তাও সব এই ছন্দের অন্তর্ভুক্ত **সংস্কৃত ছন্দ**। সংস্কৃত ছন্দ সাধারণত দুই ভাবে বিভক্ত বৃত্ত আর জাতি। অক্ষর সংখ্যার দ্বারা বৃত্ত এবং মাত্রার দ্বারা জাতিছন্দ নির্দ্ধারিত। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলায় যে সব তৎসম ছন্দ রাতি হয়েছে তার সবই তার মাত্রা নির্ভর, সুতরাং এগুলিকে জাতি ছন্দ বলা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দি।

ছন্দ—

ভুজঙ্গ প্রয়াত—প্রতি চরণে : ২ অক্ষর বিন্যাস, লঘু+গুরু+গুরু

। ॥ । । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে

। ॥ ॥ । ॥ । । ॥ ॥

সতীদে সতীদে সতীদে

তোটক—১২ অক্ষর—বিন্যাস, লঘু+লঘু+গুরু

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥

কত কাল পরে বল ভারতরে

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥

দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে

তুনক—১৫ অক্ষর—বিন্যাস, গুরু+লঘু

॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥

মৈল দ ক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে

॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥

ভাংতের তুণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে

মন্দাক্রান্তা—১৭ অক্ষর-বিন্যাস গুরু+গুরু+লঘু+গুরু+লঘু+লঘু+লঘু+লঘু+(লঘু+গুরু+গুরু)×৩

॥ ॥ । ॥ | । । । । । । ॥ | ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥

পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল | কই গো কই মেঘ উদয় হও

এইভাবে প্রাচীন বাংলায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে অনেক ছন্দ রচিত হয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও অনেক সংস্কৃত ছন্দের হিল্লোল বাংলায় আনতে চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের রীতি বাংলায় মেনে চলতে হয়েছে তাই এ সবগুলি ধ্বনি প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—

সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি থেকে বাঙলা উচ্চারণ রীতি অনেকটা পৃথক তাত আগেই বলেছি সুতরাং মাত্রার ও ছন্দের খাতিরে শব্দের যে উচ্চারণ করা হয় তা একান্তই কৃত্রিম। তার ফলে আধুনিক বাংলার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যে সব কবিতা দেখা যায়, তাতে সংস্কৃতানুগ মাত্রা উচ্চারণের রীতি সব সময়ে হয়ত রক্ষা করা যায়নি।

অনেকক্ষেত্রেই সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে যা হওয়া উচিত তার ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। যেমন—

। । ॥ । । । । | । । ॥ ॥ ।
পাষাণের | স্নেহধারা | তুষারের | বিন্দু

। । । । । । । । । ॥ ॥ ।
ডাকে তোরে | চিতলোল্ | উতরোল্ | সিন্ধু

দেখা যাচ্ছে এখানে অ আ সবই একমাত্রা ধরা হয়েছে। এইভাবে আরো দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাঙলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি পুরোপুরি বজায় থাকছেনা। কেবল মাত্র হলন্ত আর যৌগিক স্বরের উচ্চারণে প্রাচীন পদ্ধতির মাত্রানিষ্ঠা বজায় রাখা হচ্ছে। আ-কাব এ-কার সব একমাত্রা ধরা হয়েছে। যেমন—

॥ । । ॥ | । । ॥ । । | । । ।
ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে

। । ॥ । । | । । । ॥ | । । ।
জল সিঞ্চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে

(২) তান-প্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

এ ছাড়া এটিকে পয়ার ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দও বলা হয়। ছন্দের লক্ষণগুলি এর নাম থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রথমতঃ এই ছন্দে অক্ষর-ধ্বনিতে একটা সুরের টান থাকে। টেনে তান রেখে পড়াই হল এই জাতীয় ছন্দের বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়তঃ—এই ছন্দে যতি সাধারণতঃ বিজোড় মাত্রার পরে পড়েনা। ছয়, আট, দশ মাত্রার পর যতির অবস্থান। এইজন্য এই ছন্দের চাল একেবারে গজেন্দ্রগমন-বিনিন্দিত ধীর ও বিলম্বিত। তৃতীয়তঃ—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য-ছন্দে এর প্রত্যেকটি অক্ষর, তা সে স্বর ব্যঞ্জন যুক্ত বা যৌগিক যাই হোক না কেন একমাত্রা বলে ধরা হয়।

অযুগ্ম অক্ষর ও যুগ্ম অক্ষর সবই হচ্ছে একমাত্রার। সুতরাং পর্ব ঠিক রেখে যুক্তাক্ষরহীন বর্ণকে সংযুক্তাক্ষরে পরিণত করলেও ছন্দের কোন ক্ষতি হয় না। টেনে টেনে তান দিয়ে পড়ার জন্যে অক্ষরের মধ্যে যে ফাঁক গড়ে ওঠে সংযুক্ত অক্ষর যেন সেই ফাঁকগুলোই ভরাট করে দেয়। মাটি যেমন জল শুষে নেয়, চোদ্দ অক্ষরী পয়ারও তেমনি সংযুক্ত অক্ষর শুষে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের এই গুণের নাম দিয়েছেন শোষণ শক্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পয়ারের একটা ছত্রকে ক্রমশ ওজন বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন কতটা সে শোষণ করতে পারে।

(ক) পাষাণ মিলায়ে যায়—গায়ের বাতাসে

(খ) পাষাণ মূর্ছিয়া যায় | অঙ্গের বাতাসে

(গ) পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায়। | অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

(ঘ) সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ | অঙ্গের উচ্ছ্বাস

(ঙ) দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ | দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত

ওজন বেড়েছে কিন্তু পয়ারের চাল পালটায়নি।

পয়ার ছন্দের বিভিন্ন রূপ

লঘু পয়ার—একপদী পয়ার—পর্বমাত্রা ৬+৫=১১ অক্ষর

বহুদিন পরে | বঁধুয়া এলে ॥
দেখা না হইত | পরাণ গেলে ॥

দ্বিপদী পয়ার বা প্রচলিত পয়ার ৮+৬=১৪ অক্ষর

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান

তরল পয়ার—প্রচলিত লঘু পয়ারের ৪ ও ৮ মাত্রায় মিল

দেখ দ্বিজ : মনসিজ : জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র : যুগ্মনেত্র : পরশয়ে শ্রুতি ॥

মালঝাঁপ পয়ার—উক্ত পয়ারেই ৪, ৮ ও ১২ মাত্রার মিল

কোতোয়াল : যেন কাল : খাঁড়া ঢাল : ঝাঁকে।
ধরি বাণ : খর শাণ : হান হান : হাঁকে ॥

দীর্ঘ পয়ার বা মহা পয়ার - ৮+১০=১৮ অক্ষর

অন্ন চাই প্রাণ চাই | আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু।
চাই বল চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু ॥

লঘু ত্রিপদী—প্রতি চরণে তিনটি পর্ব এবং ১ম ও ২য় পর্বান্তের মিল দেখানর জন্ত চরণটিকে সাধারণতঃ ভেঙ্গে দুই পংক্তিতে সাজান হয়। ৬+৬+৮=২০ অক্ষর

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠকরে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী বা লাচাড়ী—৮+৮+১০=২৬ অক্ষর

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ।

লঘু চৌপদী—৬+৬+৬+৫=২৩ অক্ষর

চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।

দীর্ঘ চৌপদী—৮+৮+৮+৬=৩০

অম্বরে অরুণোদয় | তলে দুলে দুলে বয় | তমসা তটিনী রাণী।
কুলু কুলু স্বনে।
নিরখি লোচন লোভা | পুলিন বিপিন শোভা। ভ্রমেন বাল্মিকী মুনি।
ভাবভোলা মনে।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর

দুটো চরণের শেষে অক্ষরের মিল থাকলে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস থাকলে তাকে বলা হয় মিত্রাক্ষর। এতক্ষণ যতগুলি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হল তা সবই মিত্রাক্ষর। মিত্রাক্ষরের কবিতায় ছেদ আর যতি সাধারণতঃ একই স্থানে পড়ে। তার ফলে বাংলা ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়ে। চোদ্দ অক্ষরী পয়ারে আট ছয় মাত্রায় ওঠাপড়াটা এতবেশী গতানুগতিক যে, তাতে চিত্তে কোন সাড়া জাগায় না।

মাইকেল মধুসূদন পয়ারের এই গতানুগতিক আর একঘেয়েমি ভাঙবার জন্য চোদ্দ অক্ষরের পর্ব বিভাগটা এমন উল্টেপাল্টে দিলেন যার ফলে ছেদ আর যতি ভিন্ন স্থানে বসল। ছেদ আর যতি আলাদা হয়ে যাওয়ায় পয়ারের একঘেয়েমি ত গেলই, উপরন্তু প্রবাহমানতাও বাড়ল।

এই যতি স্থাপনের বৈশিষ্ট্যই হল মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব। আজকের দিনে মধুসূদনের কৃতিত্বের সম্যক পরিমাপ করা সহজ নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ঈশ্বরগুপ্তের যুগ, কৃত্তিবাস কাশীদাসের যুগ। সেই একঘেয়ে চোদ্দ অক্ষরি ছাঁদে বাঁধা একটানা গতি, কোন বৈচিত্র্য নেই, ওঠাপড়া নেই, চমক নেই, নিদ্রাকর্ষক একঘেয়েমি চলেছে ত চলেইছে।

মাইকেল তাঁর বিপুল প্রতিভার যাদুদণ্ডের স্পর্শে সেই একঘেয়ে চোদ্দ অক্ষরি কাঠামো বজায় রেখেই তার মধ্যে আনলেন যথেচ্ছ যতির উর্মিমুখরতা। যতি-

পাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় যে প্রবহমানতা বাড়ল, তাতে কবিতার একটি নূতন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হল।

—পরবর্তী কবিরা এই নূতন দিগন্তে নব নব সৃষ্টি সাক্ষর রাখতে পারলেন।

যতি বৈচিত্র্যই হল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণ শক্তি। সমসাময়িক কালের সমালোচকবৃন্দ এই প্রাণশক্তিটির সন্ধান পাননি। এমনকি স্বয়ং কবিও বোধহয় নয়।

এই ছন্দের তিনি নাম দিয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর, কারণ চরণান্তিক মিল তিনি রাখেন নি। পংক্তির শেষে মিলহীনতাটা অবশ্য এই ছন্দের প্রধান কথা নয়, প্রধান-কথা হচ্ছে ছেদের আর যতির বিভিন্নতা।

সম্মুখ সমরে*পড়ি। বীর চূড়ামণি।
বীরবাহু*চলি গেলা। যবে যমপুরে।
অকালে**কহ*হে দেবি। অমৃত ভাষিণী*।
কোন বীর বরে* বরি। সেনাপতি পদে।*
পাঠাইলা রণে*পুনঃ। রক্ষ কুলনিধি।
রাঘবারি ?**

[। চিহ্ন দিয়ে পর্ব বিভাগ ও * চিহ্ন দিয়ে ছেদ বা অর্থ বিভাগ দেখান হল]

আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় চোদ্দ অক্ষরের পয়ারের ৮+৬ পর্বভাগটা অমিত্রাক্ষরেও অব্যাহত আছে। তবে ছেদ যতিকে অনুসরণ করেনি। ছন্দযতি পয়ারের ৮+৬ মাত্রার পর্বভাগ মেনে চলেছে, অথচ ভাবযতি বা ছেদ চলেছে স্বতন্ত্রভাবে, ভাবের প্রবহমানতা অনুসরণ করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ার ছন্দ থেকে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও পয়ারের আধারেই তা রচিত। পয়ারের উচ্চারণ ভঙ্গী ও পয়ারের লয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে অস্বীকার করা হয়নি।

অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাস না থাকায় যেটুকু শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল, মাইকেল প্রচুর সংযুক্তধ্বনির সাহায্যে এবং অসংখ্য গম্ভীর তৎসম শব্দের ব্যবহারে তা রোধ করেছেন। পয়ারের শোষণ শক্তিকে মধুসূদন সার্থকভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের দুটো প্রধান লক্ষণ—চরণান্তিক মিলহীনতা এবং ছেদ ও যতির অমিত্রতা। মাইকেলের পরে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিবৃন্দ এই নূতন ছন্দে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর রচনায় হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিল সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃত শ্লোকে পদান্তিক মিল থাকে না এবং চারি পদে স্তবক হয়। এই আদর্শে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়ে হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষরের প্রাণধর্মের পরিচয় পাননি, তাই

তিনি ছন্দে প্রবহমানতা আনতে পারেননি—অমিত্রাক্ষর তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে অমিল পয়ার মাত্র। যথা—

কহিলা এতেক সূর্য। ঝটিকার বেগে
চারিদিক হতে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

অথবা

বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুণীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের সদনে॥ (বৃত্রসংহার)

নবীনচন্দ্রের কোমল মধুর লিরিক-উচ্ছ্বাস মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের গাম্ভীর্য ও তেজস্বিতা বজায় রাখতে পারেনি। তিনিও ছেদ ও যতির অমিত্রতার গুরুত্ব তেমন অনুধাবন করতে পারেন নি, তাই মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের সার্থক অনুবর্তন তাঁর দ্বারাও সম্ভব হয়নি। যথা—

সায়াহ্নে আবার বন হইতে পুরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
শ্যামলী, ধবলী, লালী ?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ ; আসিত ছুটিয়া—

অথবা

দেখিল জগৎ
নিশীথিনী ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ংকর,
মৃত্যু ছায়া সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে! কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব বক্ষে শত সংখ্যাতীত
ওই মহানগরের দীপালোক মত।

(রৈবতক)

এর পরে রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করতে হয়। পূর্ববর্তী কবিবৃন্দ যেমন ছেদ যতির অমিত্রতাকে গৌণ করে চরণান্তিক মিলহীনতাই মুখ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ

করেছিলেন তার বিপরীত। অর্থাৎ ছেদযতির অমিত্রমূলক ছন্দে চরণান্তিক মিল যোজনা করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে নূতন সৌন্দর্য যোজনা করেছিলেন—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে।
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই!

মাইকেলের মত তিনি কখনও বিজোড় মাত্রার শব্দের পরে ছেদ স্থাপন করেন নি। তাঁর চরণগুলিও ১৪ মাত্রা, যতি আটে আর ছয়ে।

এ ছাড়া অন্তমিলহীন অমিত্রাক্ষরও তিনি রচনা করেছেন —

"দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ। নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা।
চিত্রকরা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।"

গৈরিশ ও মুক্তক ছন্দ—

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙেই গৈরিশ আর মুক্তক ছন্দ তৈরী হয়েছে। মাইকেল ছেদকে যতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও পংক্তি গঠনটা চোদ্দ অক্ষরী পয়ারের ঢঙেই রেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের সংলাপেব জন্য প্রবাহমানতার দিকেই ঝোঁক দিলেন বেশী এবং সেই হিসাবে ছেদ অনুসারে পংক্তি বিন্যাস করতে গিয়ে একটি নূতন ছন্দের রূপ দিলেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে গৈরিশ ছন্দ। যথা

নীর হেরি ' নারী চক্ষে | দয়া না করিব,
প্রবীরে বধিব।
শুনি মম | নাম গান
সদয় হৃদয়—
পার্থ নাহি | প্রবীরে নাশিবে।

অবশ্য গিরিশচন্দ্রের পূর্ব থেকে এ জাতীয় ছন্দের প্রচলন বাংলায় ছিল। গিরিশচন্দ্রই এর ব্যাপক প্রচলন করেন।

এর থেকে মুক্তক ছন্দ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে মাত্র। মুক্তকছন্দে যতি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত—ছেদ অনুসারেই পর্ব গঠিত এবং পর্ব বিন্যাস অনুসারেইছন্দের গঠন

যতির বন্ধন থেকে এ ছন্দ সম্পূর্ণ মুক্ত বলেই এর নাম মুক্তক ছন্দ। এই ছন্দে পর্ব দৈর্ঘ্য একান্ত অনিয়মিত—দুই থেকে দশমাত্রার পর্ব সবই এই ছন্দে দেখা যায়—

হীরা মুক্তা | মাণিক্যের ঘটা।
যেন | শূন্য দিগন্তের | ইন্দ্রজাল | ইন্দ্রধনুচ্ছটা।
যায় যদি | লুপ্ত হয়ে যাক।
শুধু থাক।
এক বিন্দু | নয়নের জল।
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল।
এ তাজমহল।

(৩) শ্বাসাঘাত-প্রধান বা বলবৃত্ত ছন্দ

এই প্রকার ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক পর্বের প্রথমে একটা প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তার ফলে ধাক্কা খাওয়া বর্ণের পরের বর্ণটি সঙ্কুচিত হয়ে যায়, ফলে উচ্চারণ হয় ক্ষিপ্র ও লঘু।

এখানে প্রত্যেক অক্ষর (হসন্ত) একমাত্রা ধরা হয় এবং পর্ব সাধারণতঃ হয় চারমাত্রার।

(১)+ । । । । + । । । । | + । । । । |+।
বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদে এল | বান

(২)+ । । । । । | + । । । । | + । । । । । | + ।
খাঁচার ভিতর | অচিন্ পাখী | কম্‌নে আসে | যায়

(৩)+ । । । । | + । । । । । | + । । । । ।| + । ।
নীল বানবে | সোনার বাংলা | করল এবার | ছারখার

ছড়ার ছন্দ সাধারণতঃ চারমাত্রা হলেও দুই, তিন মাত্রায় ছড়ার ছন্দও আছে—

দুইপর্বের ছড়ার ছন্দ।

\+ । । । । । | + । । ।
ফিরছে তরুণ | স্ফূর্তিতে

\+ । । । । | + । । । ।
ডালিম্ ফুলী | কুর্তিতে

তিনপর্বের ছড়ার ছন্দ

\+ । । । । | + । । । । | + ।
পায়ের তলায় | নরম্ ঠেকল | কি

+ । । । । । | + । । । । । | + ।
আস্তে একটু | চল্ না ঠাকুর | ঝি

ছড়ার ছন্দের উপাদান হল কথ্য ভাষা, তাই পূর্বের কবিরা কাব্যরচনায় এই ছন্দের ব্যবহার বিশেষ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ হলন্তপ্রধান কথ্যভাষা ব্যবহার করে বহুপ্রকার ছন্দ বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছেন। ছন্দ যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথও এই শ্বাসাঘাতযুক্ত হলন্ত প্রধান অথচ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করে ছন্দের অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন।

॥ । । | ॥ । । | ॥ । । | ॥ ।
একলাটি | আজ ঘরে | পারবো না | রই্তে

॥ । । | ॥ । । । | ॥ । । । | ॥ ।
চাঁদ ডাকে | পাপিয়াকে | দুটো কথা | কইতে

সত্যেন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন গরবা ছন্দ, কাজি নজরুল ইসলাম এই ছড়ার ছন্দেরই কিছু ইতরবিশেষ করে গজল ও রুবাই রচনা করেছিলেন।

+ । । । । | + । । । । | + । । । । । । | + ।
(বাগিচায়) বুলবুলি তুই | ফুল শাখাতে | দিসনে আজি | দোল

। । । । । | । । । । । | । । । । । | ।
(আজো তার) ফুল কলিদের | ঘুম টুটেনি | তন্দ্রাতে বি | লোল

রুবাঈ—

। । । । । | । । । । । | । । । । । | । । । ।
এই দুনিয়ার্ | উর্ধ্বে অধে | ডাইনে বাঁয়ে | যেদিকে চাই

। । । । । | । । । । । | । । । । । | । । । । ।
আতস বাজির | কারসাজি সব | আব কিছু নাই | আব কিছু নাই

মোটকথা, সাধারণ ভাবে দেখলে তিনপ্রকার ছন্দে মাত্রা গণনার নিয়ম তিনরকম—তারি উপর পর্ব গঠন নির্ভর করে এবং তারি উপর নির্ভর করে ছন্দের নাম—

(১) মাত্রা প্রধান—হসন্ত অক্ষর দুমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুমাত্রা এবং স্বরান্ত অক্ষর একমাত্রা। (অবশ্য বাংলা মাত্রাপ্রধান ছন্দে সর্বক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না, আগেই তা উল্লেখ করেছি।

চন্দন = চন্ + দন্ = ২ + ২ = ৪ মাত্রা

(২) তান প্রধান—অক্ষর মাত্রেই একমাত্রা (হ্রস্ব দীর্ঘ সংযুক্ত বিযুক্ত যাই হোক)

চন্দন = ১ + ১ + ১ = ৩ মাত্রা

(৩) বল প্রধান—হসন্ত অক্ষর একমাত্রা, হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরও একমাত্রা।

চন্দন = চন্ + দন্ = ১ + ১ = ২ মাত্রা

অবশ্য ওদের মিশ্রণেও নূতন নূতন ছন্দ গঠিত হয়েছে ও হচ্ছে, সে কথাও এখানে উল্লেখ করেছি।

কোন কবিতার ছন্দলিপি লিখতে হলে ছন্দ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত ভাবে তার পরিচয় পত্রটি রচনা করতে হয়—

(১) ছন্দের রীতি অর্থাৎ ধ্বনিপ্রধান, না বল প্রধান

(২) পর্বসংখ্যা—চরণের পর্বভাগের সংখ্যা

(৩) চরণ—কয় পর্বে চরণ

(৪) স্তবক—স্তবকের চরণ সংখ্যা

(৫) লয়—ঢিমা মধ্য না দ্রুত লয়ের ছন্দ

দৃষ্টান্ত—

। । । । । । । | । । । । । । । | । । । । । । । | । ।
(১) শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে | ঋণে
। । । । । । । | । । । । । । । | । । । । । । । | । ।
বাবু কহিলেন | বুঝেছ উপেন | এ জমি লইব | কিনে

ইত্যাদি

রীতি—ধ্বনি প্রধান

পর্ব—ষান্মাত্রিক পর্ব

চরণ—চতুঃপার্বিক (শেষ পর্ব অপূর্ণ)

স্তবক—১২টি মিতাক্ষর চরণযুক্ত

লয়—মধ্যলয়ের ছন্দ

। । । । | । । । । । । | । । । । । । | । ।
(২) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে
। । । । । | । । । । | । । । । । | । ।
বন্দী হতেম | না জানি কোন্ | মালবিকার | জালে

রীতি—শ্বাসাঘাত-প্রধান (অনেক সময় এই ধরণের ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে মনে হতে পারে কিন্তু মাত্রাবৃত্তের মত করে পড়লে বিভিন্ন পর্বের মাত্রা বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে)

পর্ব—চার মাত্রার পর্ব

চরণ—চার পর্বের চরণ (শেষ পর্ব অপূর্ণ)

স্তবক—দুই মিতাক্ষর চরণ, লয়—দ্রুতলয়ের ছন্দ

| | | | | | | | | | | ! | | | |
(গ) জন্ম বৃথা! কর্ম বৃথা! | বৃথা বংশ খ্যাতি! |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
কীর্তিমান জনকের। পুত্র হওয়া* বৃথা। |

| | | | | | | | | | | | | | | |
স্বনামে যদি না ধন্য | হয় সর্বলোকে |

| | | | | | | | | | | | | | | |
জীবনে জীবন অন্তে | চিরস্মরণীয়! |

[*দ্রুত উচ্চারণে হওয়া শব্দটির "ও" বর্ণ প্রায় অনুচ্চারিত, তাই হওয়া দুই মাত্রার শব্দ]

রীতি—তান প্রধান বা পয়ার=১৪ মাত্রার চরণ

সংযুক্ত বিযুক্ত বর্ণ, হসন্ত স্বরান্ত অক্ষর কিংবা হ্রস্ব বা দীর্ঘস্বর সবই একমাত্রা।

পর্ব—আট মাত্রা ও ছয় মাত্রার দুইটি পর্ব

চরণ—দুইটি পর্বে চরণ (প্রথম পর্ব ও শেষ পর্ব ৬ মাত্রা)

স্তবক—চারিটি মিতাক্ষরের চরণযুক্ত

লয়—বিলম্বিত

'গদ্যছন্দ'—

গদ্যছন্দ শব্দটি হঠাৎ শুনলে স্ববিরোধী বলে মনে হয়। কথাকে ছন্দে বেঁধে তবেই ত আমরা গদ্য রচনা করি, ছন্দহীন কথাই হল গদ্য। গদ্যকে আবার ছন্দে বাঁধা যাবে কি করে?—সুতরাং অনেকের মতে গদ্যছন্দ—কথাটাই হল সোনার পাথর বাটির মত উদ্ভট।

—কিন্তু ধীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে গদ্যের মধ্যেও অন্তর্নিহিত ছন্দের একটা সুর আছে। এমন অনেক কথা আছে আঙ্গিকের দিক থেকে তা গদ্যের কাঠামোযুক্ত হলেও অন্তরে একটা ছন্দের দোলা আমরা অনুভব করি। আমেরিকার বিখ্যাত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান যে কবিতা লিখলেন তার বাইরের রূপসজ্জা গদ্যের, তা সত্ত্বেও তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে কারো আপত্তি হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন গদ্যে, কিন্তু য়ুরোপের রসিক সমাজ তাকে কবিতা গ্রন্থ হিসাবেই মেনে নিয়েছিল। তাহলে গদ্য পদ্যের মূল পার্থক্যটা কোথায়? কেবলমাত্র বাইরের আঙ্গিকের উপরেই কি কবিতার প্রাণ নির্ভর করবে? রসিকজন বলেন কবিতা কেবলমাত্র বাইরের দেহ গঠনের উপর নির্ভরশীল নয় প্রাণের স্পন্দনেও এর বৈশিষ্ট্য আছে। অন্তমিল বা মাত্রা-পরিমিতি দিয়ে কবিতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যাবে না। কবিতার পরিচয় বিষয়বস্তুর ভাবসম্পর্কে, অন্তর্নিহিত ছন্দদোলায়। বাংলা কবিতায় মাত্রা-নিগড়বদ্ধ চলার চাল থেকে প্রথমে মুক্তি দিয়েছিলেন শ্রীমধুসূদন অমিত্রাক্ষর রচনা করে। আর প্রচলিত সর্বপ্রকার ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যের সহজ চলার পথকে নিরঙ্কুশ করলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় গদ্যছন্দের জনক। সুতরাং গদ্যছন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করেই আলোচনার সূত্রপাত করি—

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন –

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। সেই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মত বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।··· পরীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। গদ্য কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, গদ্য কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস···"

—এত হল আঙ্গিকের দিকের কথা। পদ্যের বিচরণ ক্ষেত্রের সীমানা বাড়িয়ে দেবার কথা তিনি বলেছেন, বলেছেন স্বাধীন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সঞ্চরণের কথা। কিন্তু বাইরের কাঠামোটাই বড় কথা নয়। সীমানার বাধা যদি ঘুচেই যায় তবে গদ্য পদ্যর মধ্যে কি কোন ভেদ থাকবে না? সকল গদ্যই পদ্য হবে? এ বিষয়ে কবি বলেছেন—

"গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোন গতির মধ্যে নাচের ধরণটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না নাচও হবে না, হবে ঘোঁড়ার চাল অথবা লম্ফ ঝম্প। কোন ছন্দে বাঁধন বেশি, কোন ছন্দে বাঁধন কম, তবু ছন্দ মাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে।

সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল, তাতে সুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই।"

—রূপকের ছলে কবি যে গদ্যছন্দের ভাবৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেইটেই আরো স্পষ্ট করে সুন্দর করে বলেছেন একখানা চিঠিতে—

"গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পঙক্তিতে বসিয়ে দিলে আচার বিরুদ্ধ হলেও সুবিচার বিরুদ্ধ না হতেও পারে যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি গদ্য আর রাশ মানছে না। অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্য তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে—এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে প্রাধান্য দিতে চাইনে। নানা রকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। -"

এইবার কবির বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট হল। তিনি বলতে চেয়েছেন—গদ্যকবিতা কেবল গদ্য হলেই হবে না তাকে কবিতাও হতে হবে। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়বস্তু যদি সুন্দর হয়, চিত্তাকর্ষক হয়, তাতে থাকে কাব্যের উপাদান, তাহলে তা ছন্দবদ্ধ আকারেই প্রকাশিত হোক কিম্বা ছন্দহীন গদ্যের আকারেই প্রকাশিত হোক কাব্য-রসাস্বাদের কোন তারতম্য হবে না। আসল বলবার কথা বিষয়টি কাব্যজাতের হওয়া চাই। অর্থাৎ কবির কথায় "এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌছাল না, এটা শোচনীয়। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভ নিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেব সাহিত্যে গদ্য কাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য বিচারে বিষয়বস্তুর উপর জোর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন কাব্য-রসাশ্রিত বিষয়বস্তুটি যেভাবেই পরিবেশিত হোক তাকে কবিতা বলতে আপত্তি নেই। তাহলে গদ্য কবিতায় ছন্দের কি বাঁধনই নেই অথবা আরো স্পষ্ট করে বলা যায় রসাত্মক বাক্য যেমন তেমন করে বললেই কি তা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য পরিগণিত হবে? না, তা হবে না, কারণ গদ্য কাব্যেরও একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ সুষমা আছে সেটা পর্বমাত্রায় বাঁধা পরিস্ফুট ছন্দ নাহলেও একটা আবাঁধা ছন্দের দোলা রচনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

"আন্তরিক প্রবর্ত্তনা থেকে সেই ছন্দ (অর্থাৎ গদ্যের আবাঁধা ছন্দ) চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে। তার ভাগগুলি অসম হয়। কিন্তু সব শুদ্ধ জড়িয়ে ভার-সামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো-ওজনের সংস্কৃত-ছন্দে এই আপাত প্রতীয়মান মুক্ত গতি দেখতে পাওয়া যায়—"

—'পুনশ্চ' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দি

কাছে এল। পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে | চাঁপা ফুলের রং।
হাওয়া উঠেছে ' শিশিরে | শির শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ | এসে লাগে
যেন কার | ঠাণ্ডা হাতের | কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে।
সাদা মেঘের আলস্য।
দেখে | মন লাগে না কাজে

আমাদের অজ্ঞাতসারেই একটা যতি সৃষ্টি হয়ে যায়। যতিগুলি অবশ্য সমমাত্রার নয়, তবু খুঁজলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২, ৪, ৬, মাত্রার পর্ব এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যাতে একটা ছন্দের দোলা সহজেই অনুভব করা যায়।

অনুশীলনী

১। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর শব্দ কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।
(ক: বি:—বি. টি. ১৯৪৭)

২। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের ব্যবহার উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও—
(ক: বি:—বি. টি. ১৯৪৯)

৩। তোমার জানা কবিতার চার পংক্তি উদ্ধৃতি করিয়া তাহার বিভিন্ন পর্ব ভাগ করিয়া দেখাও। যতি, মাত্রা ও প্রবহমান পয়ার এই সকল সংজ্ঞার অর্থ বল— (ক. বি.—বি. টি. ১৯৫০)

৪। স্বনিছে পবন......শাখে পাখী (মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে।
পর্বভাগ করিয়া দেখাও, ইহার যতি কোথায় পড়িয়াছে? (ক. বি. বি. টি. ১৯৫১)

৫। পয়ারের ভিত্তিতেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়াছিলেন—পয়ার ও অমিত্রাক্ষরের সম্পর্ক দেখাইয়া ইহা প্রতিপন্ন কর। (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫২)

৬। মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরবর্তী ছন্দকুশলী কবিদের হাতে কিছুটা পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বিশেষত: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ অবলম্বনে তাহার পরিচয় দাও— (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫৩)

৭। কবিতা পড়িতে ও পড়াইতে গিয়া পয়ার ও অমিত্রাক্ষর এই দুটি ছন্দের কোন দিক দিয়া সাদৃশ্য ও পার্থক্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছ? (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫৪)

৮। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির পর্বভাগ করিয়া দেখাও। ইহাতে কোথায় কোথায় যতি পড়িয়াছে?
জন্ম বৃথা কর্ম বৃথা.........চিরস্মরণীয়। (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫৩)

৯। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা সাহিত্যের পাঠ দিতে গিয়া ছন্দের সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকা অনেক শিক্ষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি? ছন্দ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা ছাত্রেরও থাকা উচিত নহে কি?— (ক: বি:—বি. টি. ১৯৫৭)

১০। 'বিদ্যালয়ে পড়াইতে গেলে শিক্ষককে 'ছন্দ' সম্বন্ধে কিছু জানিতেই হইবে এমন কি কথা?' —আলোচনা করুন।

১১। বাঙলা ছন্দ বিচারে এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? তৎসম ছন্দ কাহাকে বলে? সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত কয়েকটি বাঙলা কবিতার উল্লেখ করিয়া ঐ ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা সাহিত্যের পাঠ দিতে গেলে শিক্ষকের ছন্দজ্ঞান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন কি? এ বিষয়ে আপনার মতামত বিবৃত করুন।

অলঙ্কার

মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ ভাষার সৃষ্টি করেছে, এ কথা পূর্ব প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করেছি। সে ভাষা হল কাজের ভাষা, নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন সাধনের ভাষা কিন্তু শুধু প্রয়োজন সাধনেই ত মানুষের আশা মেটে না। আগেই বলেছি: জল আনবার জন্য কাজের মানুষ ঘট তৈরী করেছে, শিল্পী মানুষ তার গায়ে নকসা এঁকেছে আনন্দ প্রকাশের জন্য। তেমনি কাজের ভাষা শিল্পী মানুষের হাতে হয়ে দাঁড়িয়েছে—আনন্দ প্রকাশের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির যে ভাষা, সে ভাষা হল সোজাসুজি কাটাছাঁটা অর্থ অভিধা দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘেরা, কিন্তু মানবমনের অসংখ্য সূক্ষ্ম অনুভূতিকে রূপ দেবার জন্য আমরা ত সেই ভাষারই সাহায্য নিই। তবে তার প্রয়োগ কৌশলের মাহাত্ম্যে নিত্যব্যবহারের জীর্ণ বাক্য মানুষকে ভাষার অতীত তীরে রসের রাজ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

অলঙ্কার কি?

'মানবের জীর্ণ বাক্যে ছন্দ মোরে দিবে নবসুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছুদূর
ভাবের স্বাধীন লোকে—

এই নূতন সুর যোজনা কার্যের প্রধান সহায়ক অলঙ্কার। প্রচলিত অর্থে অলঙ্কার হল অঙ্গ প্রসাধনের ভূষণ। যথাস্থানে যথোপযুক্ত ভাবে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হলে দেহের যেমন শোভা সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, তেমনি কাব্যালঙ্কার ও কাব্যদেহের শোভাবৃদ্ধির সহায়ক। বামনাদি কোন কোন ভারতীয় প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা ত মনে করতেন অলঙ্কারই হচ্ছে কাব্যদেহের প্রাণ।

পরবর্তী মতে রসই হচ্ছে কাব্য দেহের প্রাণ এবং অলঙ্কার হচ্ছে সেই রসলোকে পৌঁছুবার একটি প্রধান সোপান। নারীদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যেমন বিচিত্র ধরণের অলঙ্কার প্রয়োজন, কাব্যদেহের সৌন্দর্য সাধনের জন্যও তেমনি নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন কবিবৃন্দ। অবশ্য দৈহিক অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যালঙ্কারের তুলনা করা হল বটে কিন্তু এ'দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। মনুষ্যদেহের অলঙ্কার হল একান্তই বাইরের জিনিস, স্বর্ণকারের দোকান থেকে তা সংগ্রহ করতে হয় কিন্তু কাব্যদেহের অলঙ্কার কাব্যের সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, কবির অন্তর থেকে কাব্যের বিষয়-বস্তু ও তার অলঙ্কার একই সঙ্গে 'অপৃথগযত্ননিবৃত্য' আবির্ভূত হয়।

ভাবকে রসলোকে উন্নীত করতে হলে ভাষাকে অলঙ্কৃত করলে কাজের সুবিধা হয় একথা সত্য, কিন্তু অলঙ্কৃত করা না করা কবির স্বতন্ত্র ইচ্ছাপ্রযুক্ত নয়। সুরসিক কবির হৃদয় থেকে অলঙ্কার যদি স্বতোৎসারিত হয় তবেই তাতে রসধর্মীতা থাকে। সুতরাং রসসৃষ্টির মূলে অলঙ্কার একটি উপাদান মাত্র। বিষয় বৈভব, প্রকাশশৈলী বা কাব্যরীতি, পদলালিত্য ছন্দমাধুর্য অলঙ্কার বৈচিত্র্য সব মিলিয়েই কাব্যকে রসান্বিত করে। এই হিসাবে কাব্যের পক্ষে অলঙ্কার যে একান্তই অপরিহার্য একথা বলা চলে না—নিরাভরণ দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য যেমন চিত্তাকর্ষক, নিরলঙ্কার কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও তেমনি হৃদয়গ্রাহী। একটা দৃষ্টান্ত দিই

"একখানি ছোটো ক্ষেত আমি একেলা—
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোটো ক্ষেত, আমি একেলা॥"

প্রকৃতির একখানি যথাযথ চমৎকার বর্ণনা—কোন অলঙ্কারই এখানে প্রয়োগ করা হয় নি—তথাপি এই বর্ণনা আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, রসসৃষ্টি করে।

আলঙ্কারিকেরা অবশ্য একে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নাম দিয়েছেন। কিন্তু অলঙ্করণের শিল্পকার্য এখানে কোথাও নাই—সেই হিসাবে স্বভাবোক্তিকে পুরোপুরি অলঙ্কার বলে অনেকে স্বীকার করেন না। যাই হোক একথা সত্য যে, কাব্য সৃষ্টির পক্ষে অলঙ্কার অপরিহার্য না হলেও সুপ্রযুক্ত অলঙ্কারের সার্থকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই।—

অলঙ্কারের শ্রেণীভাগ—

কাব্যের মূল হল কতকগুলো শব্দার্থময় বাক্য। অর্থাৎ শব্দ এবং তার অর্থ এই দুই-এ মিলে তবেই হয় বাক্য এবং বাক্যই হল কাব্যের একমাত্র উপাদান। তাহলে কাব্যকে অলঙ্কৃত করতে হলে শব্দ ও অর্থ বাক্যের এই দুটি অংশকেই অলঙ্কৃত করতে হয়। শব্দের অলঙ্করণ যেমন ধ্বনি সৌন্দর্যের প্রকাশক, অর্থের অলঙ্করণ তেমনি ভাব সৌন্দর্যের উদ্‌ঘাটক। এই হিসাবে অলঙ্কার দুই শ্রেণীর—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার—শব্দগত সৌন্দর্য অর্থাৎ ধ্বনিসৌন্দর্যকে প্রকাশ করে এবং এর আবেদন প্রধানত -কানের কাছে। শব্দের ধ্বনি নিয়ে এই অলঙ্কারের যত খেলা, তাই অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দ বদল করলেই এই অলঙ্কার নষ্ট হয়ে যায়।—

যেমন -

শব্দালঙ্কার

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ—
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুল নারী

এখানে ঞ্জ ধ্বনিটি সাতবার উচ্চারিত হয়েছে—তাছাড়া ম, ক, ও গ ধ্বনি একাধিক বার উচ্চারিত হয়ে সুন্দর অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে—কিন্তু এই কবিতাটিই যদি একটু অদল বদল করে লেখা যায়—

ফুল্ল বিকচ কুসুম রাশী মধুপ শব্দ নিন্দি হাসি
হস্তির গতি তুল্য গমন সুন্দরী কুল নারী—

তাহলে এর ধ্বনি-গত সৌন্দর্যের অনেকখানি হানি ঘটে, যদিও অর্থের দিক দিয়ে বিশেষ তফাৎ হয়নি। এই শব্দালঙ্কার হল মোটামুটি ছয় রকমের—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি আর পুনরুক্তবদাভাস—

এই প্রত্যেকটি অলঙ্কারের আবার নানা রকম প্রকার ভেদ আছে। দৃষ্টান্তসহ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল। তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অলঙ্কারের স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা দেখে নেবেন।

অর্থালঙ্কার হল অর্থের সৌন্দর্য-উদ্‌ঘাটক। অর্থাৎ যে অলঙ্কারের দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় এবং সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় তাই হল অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কারের আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধি দ্বারা অর্থ বুঝে তবেই এই অলঙ্কারের সৌন্দর্য

এখানে উপভোগ করা যায়। আর এক কথা, সৌন্দর্য এখানে শব্দগত নয়, অর্থগত, তাই এই অলঙ্কারে অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রাননা না বলে শশীমুখী বলাও চলতে পারে—অলঙ্কারের পার্থক্য হবে না।

শব্দালঙ্কারের মত অর্থালঙ্কারও অনেক প্রকারের। তবে তাদের সাধারণ লক্ষণ দেখে শ্রেণীকরণ করলে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা সাদৃশ্য মূল, বিরোধ মূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল ও গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূল।

কোন কবিতার অলঙ্কার নির্ণয় করতে হলে আগে সেটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত ঠিক করে নিলে সুবিধা হয়। শ্রেণীগত লক্ষণগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হলে অলঙ্কার নির্ণয় অনেকখানি সহজ হয়ে আসবে।

প্রথমেই বলি "সাদৃশ্য-মূল অলঙ্কার।" এর মূল কথা দুইটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা, ভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোন একটা অভিন্ন গুণ বা সমধর্মিতার সন্ধান করা। এই জাতীয় অলঙ্কার হচ্ছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, দীপক, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তুপমা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি, তুল্যযোগিতা—প্রভৃতি—

অর্থালঙ্কার

বলাই বাহুল্য, অর্থালঙ্কারের মধ্যে সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারেরই বহুল প্রয়োগ এবং সংখ্যার দিক দিয়েও এরা বেশী। এগুলির বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে সম্ভব না হলেও প্রধান কয়েকটি সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের স্বরূপ লক্ষণ সংক্ষেপে উল্লেখ করি।

মনে করা যাক, আকাশের চাঁদ আর মানুষের মুখ। বলাই বাহুল্য এই দুটি একেবারেই ভিন্নজাতীয় বিসদৃশ পদার্থ কিন্তু কবি দার্শনিকেরা এদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য বা সমধর্মিতা আবিষ্কার করেছেন, সে হল স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বা শোভা এবং সুডৌল আকৃতি। এই সাদৃশ্য প্রকাশ করবার জন্য উপমা রূপকাদি বিভিন্ন সাদৃশ্যমূল অর্থালঙ্কার ব্যবহৃত হয়। নিম্নের তালিকা থেকে এদের বৈশিষ্ট্য সহজেই মনে রাখা সম্ভব হবে—

একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে; উপমা কখনই সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে হবে না, সে হবে তুলনীয়। মুখের সঙ্গে চাঁদ বা পদ্মের উপমা হতে পারে কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হবে তুলনা, উপমা নয়।

চাঁদের মত মুখ—উপমা। (ভিন্নজাতীয় পদার্থের সঙ্গে তুলনা)

মুখই চাঁদ—রূপক। (ভিন্নজাতীয় পদার্থের অভেদত্ব জ্ঞান)

মুখ যেন চাঁদ—উৎপ্রেক্ষা। (উপমেয়কে উপমান বোধ)

মুখের মত চাঁদ—প্রতীক। (উপমানকে উপমেয় বোধ)

চাঁদের চেয়েও মুখ সুন্দর —ব্যতিরেক। (উপমেয় উৎকৃষ্টতর)

একি মুখ? না চাঁদ?—সন্দেহ। (উপমান উপমেয়তে সংশয়)

মুখ নয় চাঁদ—অপহ্নুতি। (উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানের প্রতিষ্ঠা)

এই মুখই চাঁদ নয় —নিশ্চয়। (উপমানকে অস্বীকার করে উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা)

বিরোধমূলক অলঙ্কার:—এদের মধ্যে প্রধান হল বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসংগতি আর বিষম। শৃঙ্খলামূল অলঙ্কার হল কারণমালা, একাবলী এবং সার। ন্যায়মূল অলঙ্কার মাত্র দুটি অর্থান্তরন্যাস ও কাব্যলিঙ্গ। গূঢ়ার্থমূলের উল্লেখযোগ্য হল ব্যাজস্তুতি, অপ্রস্তুত প্রশংসা, সূক্ষ্ম অর্থাপত্তি ও স্বভাবোক্তি।

এগুলির বিস্তৃত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য বহির্ভূত। তবে প্রধান কয়েকটি অলঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরের পরিচ্ছেদে দেওয়া হল।

সংক্ষিপ্ত অলঙ্কার পরিচয়

অনুপ্রাস—একজাতীয় ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একাধিকবার উচ্চারিত হলে ধ্বনিসাম্য-জনিত যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাকে বলে অনুপ্রাস অলঙ্কার।

যেমন—চল চপলার চকিত চমকে

করিছে চরণ বিচরণ

কোথা চম্পক আভরণ

(এখানে চ ধ্বনি ছ'বার, ক ধ্বনি চার বার আবৃত্ত হয়ে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে)

অনুপ্রাস মোটামুটি পাঁচ প্রকার—

(১) **বৃত্ত্যনুপ্রাস** (২) **ছেকানুপ্রাস** (৩) **লাটানুপ্রাস** (৪) **শ্রুত্যনুপ্রাস** এবং (৫) **অন্ত্যানুপ্রাস**

(১) **বৃত্ত্যনুপ্রাস**—একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি দুই বা ততোধিকবার একই ক্রমে বা বিপরীত ক্রমে ধ্বনিত হলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়।

(ক) কানু কহে **রাই** কহিতে ড**রাই**, ধবলী চ**রাই** মুঞি (একই ক্রমে)

(খ) গত-**যামিনী** জিত-**কামিনী** **কামিনী**-কুল লাজে (,,)

(গ) রসাত্মক **বাক্যই কাব্য** (বিপরীত ক্রমে)

(ঘ) **কবি বুকের** দুখের কাব্য (,,)

(২) **ছেকানুপ্রাস**—একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যদি দুবার মাত্র বাক্যে ধ্বনিত হয় তবেই ছেকানুপ্রাস হয়। দুয়ের অধিক হলেই বৃত্ত্যনুপ্রাস।

(ক) যত পায় **বেত** না পায় **বেতন** তবু না চেতন মানে

(খ) চলইতে **পঙ্কিল পঙ্কিল** বাট

(গ) **লাটানুপ্রাস** —অর্থসমেত একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটলে লাটানুপ্রাস হয় –

(ক) **কালো** তা সে যতই **কালো** হোক

(খ) **গাছে গাছে** ফুল, **ফুলে ফুলে** অলি সুন্দর ধরা তলে

(৪) **শ্রুত্যানুপ্রাস**—কণ্ঠ তালু দন্ত প্রভৃতি যে কোন একস্থান থেকে উচ্চারিত ভিন্ন বর্ণের সঙ্গে যদি সুমধুর সাদৃশ্য ঘটে তবে শ্রুত্যানুপ্রাস হয়। শ্রুত্যানুপ্রাস ঠিক একই বর্ণের অনুপ্রাস নয় তবে একজাতীয় বর্ণের অনুপ্রাস।

(ক) মৌলো**ভী** যত মৌল**বী** আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে

(ভ ও ব-এর শ্রুত্যানুপ্রাস)

(খ) আমি যেটা বলি সো**জা** সেটা জলবৎ যায় বো**ঝা**

(জ ও ঝ-এর শ্রুত্যানুপ্রাস)

(৫) **অন্ত্যানুপ্রাস**—কবিতার চরণের অন্তে যে মিল তাকেই বলে অন্ত্যানুপ্রাস।

(ক) শুদ্ধ নিয়ম মতে মুবগিরে পা**লিয়া**।
গঙ্গা জলের যোগে রাঁধ তার কা**লিয়া**॥

(খ) রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

যমক—রচনার মধ্যে একই শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়ে যদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে যমক অলঙ্কার হয়ে থাকে। যমক তিন প্রকার—(১) **আদ্য যমক** (২) **মধ্য যমক** (৩) **অন্ত্য যমক**

(১) **আদ্যযমকে** যুগ্ম শব্দের একটি বাক্যের আদিতে ব

(ক) **এলো**কেশী **এলো** কে রে রণে

(খ) **ভারত ভারত** খ্যাত আপনার গুণে

(২) **মধ্য যমক**—যুগ্মশব্দ বাক্যের মধ্যে বসে

(ক) ভাবিলে ভবের **বাজি বাজি** হয় ভোর

(খ) নবীন ধানের আ**ঘ্রাণে** আজি **অঘ্রাণ** হল মাৎ

(৩) **অন্ত্য যমক**—যুগ্মশব্দ বাক্যের শেষে বসে

(ক) যাইতে **মানস সরে** কার না **মানস সরে**

(খ) দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি **পান**।
আমি যেই তেঁই পাই অন্যে নাই **পান**॥

অনুপ্রাস আর যমক অলঙ্কারদ্বয় সহসা এক রকম মনে হতে পারে-- সুতরাং এ'দুয়ের পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য। অনুপ্রাসে যে শব্দ আবৃত্ত হচ্ছে সে বারবার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে না কিন্তু যমকের সূত্রে অবশ্যই বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করবে।

অন্ত্যানুপ্রাস ও অন্ত্য যমক প্রায় একই প্রকার। ধ্বনিগত মিলের বিচারে যাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয় আবার ধ্বনিগতমিল অথচ অর্থগত গরমিল এই উভয়ের বিচারে অন্ত্য যমক—

দয়া কর দয়া কর পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার আমি দিই কর॥

এই অন্ত্যনুপ্রাসও বটে আর অর্থ পার্থক্য হেতু অন্ত্য যমক ও বটে ; অবশ্য অর্থ পার্থক্য না থাকলে যমক হবে না—

শ্লেষ—একটি শব্দ যখন একাধিক অর্থে একবার মাত্র বাক্যে বসে তখনই হয় শ্লেষ অলঙ্কার। অন্নদার আত্মপরিচয় জ্ঞাপক ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পদটি শ্লেষের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ

শ্লেষ দুই প্রকার--**সভঙ্গ** ও **অভঙ্গ**

যেখানে মূল শব্দের এক অর্থ আর শব্দ ভাঙ্গলে অন্য আর এক অর্থ পাওয়া যায় সেখানে **সভঙ্গ শ্লেষ** হয়

(ক) পরমকু-লীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত
কুলীন = বংশমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কু-লীন = জগদাত্ম

(খ) জগতটা কার বশ ?
(জগত টাকার বশ)

অভঙ্গ শ্লেষে—শব্দটি না ভেঙ্গে পুরাপুরি শব্দের অর্থ ধরা হয়

(ক) **কাটছে** বটে পোকায় কিন্তু
আলমারি কি সিন্দুকেই

(খ) আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিলা তোমার স্বামী বাঁধি নিজ **গুণে**

বক্রোক্তি—এক অর্থে ব্যবহার করা বাক্যকে যদি কণ্ঠস্বরের বিকৃতি বা পরিবর্তনের ফলে শ্রোতা অন্য অর্থ সংযোজন ক'রে ব্যাখ্যা করতে পারে, তবেই বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়—বক্রোক্তিতে বক্তা ও শ্রোতা দুইজন থাকে। বক্তা এক অর্থে কথা বলেন, শ্রোতা তাকে বেঁকিয়ে অন্য অর্থ ধরেন।

বক্রোক্তি অলঙ্কার দু'রকম হয়—বক্তার কথা শ্রোতা যখন শ্লেষের আশ্রয়ে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেন তখন তাকে বলি **শ্লেষ বক্রোক্তি**।

প্রশ্ন—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

উত্তর—সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়।

প্রশ্নকর্তা সুরাসক্ত অর্থে মদ্যাসক্ত বুঝাচ্ছেন অথচ শ্রোতা তাকে সুর অর্থাৎ দেবতায় আসক্ত উত্তর দিচ্ছেন।

আর এক প্রকার বক্রোক্তি হয় কণ্ঠস্বরের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে ; তাকে বলে **কাকু বক্রোক্তি**—

(ক) ফোটেকি কমল কভু সমল সলিলে ? (অর্থ—ফোটে না)

(খ) বিদ্যুতে কেবা মুঠিতে ধরিতে পারে ? (অর্থ—পারে না)

ধ্বন্যুক্তি—শব্দের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থের আভাস ঘটে অর্থাৎ ধ্বনাত্মক শব্দের প্রয়োগে যদি মনের মধ্যে একটা সুরের দোলা লাগে তবে ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার হয়।

চরকার ঘর ঘর পড়শীর ঘর ঘর

অর্থালঙ্কার—

উপমা—বিভিন্ন জাতীয় অথচ সদৃশ গুণবিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখ করে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বলে উপমা।

উপমা অলঙ্কারের চারটি অংশ—**উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম** এবং **সাদৃশ্য বাচক শব্দ**।

অংশগুলির পরিচয় প্রথমেই গ্রহণ করা প্রয়োজন—যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হচ্ছে, তাকেই বলা হচ্ছে **উপমান**। এই উপমান বস্তুটি থাকে অনুপস্থিত কিন্তু এই উপমান বস্তুটির গুণের সাদৃশ্যে যার তুলনা করা হয় সেই হল **উপমেয়**। আর যে গুণটি উপমেয় আর উপমানের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে সেই সাদৃশ্যবাচক গুণটি হল **সাধারণ ধর্ম**। আর যে শব্দ দিয়ে উপমান আর উপমেয়কে গাঁথা হয় তাকে বলে **সাদৃশ্যবাচক শব্দ**—যথা, মতো, ন্যায়, সদৃশ, সম, সমান, হেন, নিভ, তুল্য, যথা··· ইত্যাদি।

"আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম

এখানে ছুরি হল উপমেয় আর অনুপস্থিত রশ্মি উপমান, সাধারণ ধর্ম হল তীক্ষ্ণ দীপ্ত আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ হল সম।

উপমা অলঙ্কারের এই চারটি অংশই যদি বর্তমান থাকে তাকে বলে **পূর্ণোপমা**।

(ক) তলোয়ার বিদ্যুতের মত চকমক করিয়া উঠিল

(খ) তোমার চুলের মত ঘন কাল অন্ধকার

উপমায় যদি কখনো একটি দুটি বা তিনটি অঙ্গ অনুপস্থিত থাকে তখন **লুপ্তোপমা** হয়।

(ক) দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ (সাদৃশ্যবাচক পদের লোপ)

(খ) মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত (সাধারণ ধর্মের লোপ)

(গ) মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে
রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তার ধরে

(উপমান 'তরলপদার্থ' লোপ)

মালোপমা—একটি উপমেয়ের যদি একাধিক উপমান হয় তবেই তাকে মালোপমা বলে—

(ক) উড়ে হোক ক্ষয়.
ধূলি সম. তৃণ সম. পুরাতন বৎসরের যত
নিস্ফল সঞ্চয়।

(খ) দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময়।

স্মরণোপমা—কোন বস্তুর অনুভব থেকে যদি অন্য কোন বস্তু মনে পড়ে যায় তবে স্মরণোপমা হয়—

(ক) মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।

উৎপ্রেক্ষা—উৎপ্রেক্ষা অর্থে সংশয়! উপমেয়কে যদি প্রবল সাদৃশ্যহেতু উপমান বলে সংশয় হয় তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ সাদৃশ্যহেতু উপমানকেই উপমেয়ের সম্ভাবনা বলে মনে হয়!

উৎপ্রেক্ষা সাধারণতঃ দুই প্রকারের। যেখানে যেন, বুঝি, মনে হয়, ইত্যাদি সম্ভাবনাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয় সেখানে বলা হয় **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা**।

(ক) নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ময়
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্যোদয়!

(খ) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।
আঁধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।

যেখানে এই সম্ভাবনাসূচক শব্দগুলি ব্যবহার করা না হয় সেখানে হয়—**প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**।

(ক) সুবর্ণ আসনে গিয়া বসে রূপবতী
চারিদিকে জ্বালি দেয় সোহাগের বাতি।

(খ) কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল। এছাড় আছে **মালা উৎপ্রেক্ষা**। একই উপমেয়ে যদি একাধিক উপমানের সম্ভাবনা ঘটে তখন হয় মালা উৎপ্রেক্ষা। এই মালা উৎপ্রেক্ষাও বাচ্য ও প্রতীয়মান ভেদে দুই প্রকার।

মালা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা –

(ক) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি
মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত,
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।

মালা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—

(ক) (শৈবলিনী কেবল বক্ষপর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্রবসনে কবরীসমেত মস্তকের অগ্রভাগ মাত্র আনত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল, মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল, সেই ভীমাব শ্যামতরঙ্গে স্বর্ণকমল ফুটিল।

সন্দেহ—উপমেয় ও উপমান দুই দিকেই যদি সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহলে হয় সন্দেহ অলঙ্কার।

(ক) কে এই নীল বরণী ?
নীল অপরাজিতা একি ! কিম্বা কাদম্বিনী ?

খ) ঐ দূরে ওই দার্জিলিঙে
পাহাড় চুড়োর মোহনা কি ?
কিংবা মেঘের হাতছানি ?

রূপক—উপমান আর উপমেয়েরা তুলনা করতে গিয়ে যখন এই দুয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন তাকে রূপক অলঙ্কার বলে। উপমান আর উপমেয় তখন যেন একই হয়ে গিয়েছে।

(ক) বালির বালিশে রোগা নদী শুয়ে আছে (বালিরূপ বালিশ)

(খ) ক্ষত্রিয় মহিমা সূর্য উঠে আর নামে (ক্ষত্রিয় মহিমারূপ সূর্য)

রূপক সাধারণভাবে তিন প্রকার (১) **নিরঙ্গরূপক**। (২) **সাঙ্গরূপক** ও (৩) **পরম্পরিত রূপক**॥

(১) **নিরঙ্গরূপক**—

একটি উপমেয়ে একটি উপমানের আরোপ হলে বলে নিরঙ্গরূপক—

(ক) খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘুচেনা?

(খ) দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।

(২) **সাঙ্গরূপক**—রূপক অলঙ্কারে উপমেয়ের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যদি উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ আরোপিত হয় অর্থাৎ উপমেয়ের ও উপমানের অঙ্গগুলির যদি অভেদ প্রদর্শন করা হয় তাহলে হবে সাঙ্গরূপক।

(ক) কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
তাতে অধর মধু, স্মিতচার
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।

(৩) **পরম্পরিত রূপক** পরম্পরিত রূপক হল কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত। একটা রূপক সৃষ্টি করে তাকে আরো পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আরো একটি রূপকের অবতারণা করলে হয় পরম্পরিত রূপক -

দেববল্লরীতে কর পল্লব শোভা পাচ্ছে

(৪) এছাড়া আছে **মালারূপক**—

যখন একটি উপমেয়কে কেন্দ্র করে একাধিক উপমানের আরোপ ঘটে তখন মালারূপক হয়—

শীতের উড়নী পিয়া গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না

উল্লেখ—

একটি বস্তুর যদি বিভিন্ন গুণের অবতারণা করা হয় তাহলে হয় উল্লেখ অলঙ্কার।

জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শস্য লক্ষী নারী,
সুষমা লক্ষী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চরি।

ভ্রান্তিমান—খুব বেশী রকম সাদৃশ্য থাকার জন্য একবস্তু অন্য বস্তু বলে মনে হয় এবং এই মনে হওয়ার ফলে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তবেই ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হবে।

সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল কুল

অতিশয়োক্তি -

উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকেই উপমেয় বলে নির্দেশ করলে হয় অতিশয়োক্তি।

(ক) আমার গৃহে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে।

(খ) আমার অন্ধের নড়ি কেড়ে নিওনা বাবা!

ব্যতিরেক—যদি উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত তাহলে হয় ব্যতিরেক।

(ক) যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ (উৎকর্ষ)

(খ) গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি পাতি জিনিয়া দশন (উৎকর্ষ)

(গ) দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর পুন তার হয় উপচয়
নরের নশ্বর তনু ক্রমশঃ হইলে তনু আরও নূতন নাহি হয়—
(অপকর্ষ)

অপহ্নুতি—উপমেয়কে গোপন রেখে বা নিষিদ্ধ করে উপমানের প্রাধান্য স্থাপন করলে হয় অপহ্নুতি অলঙ্কার।

(ক) বৃষ্টি ছলে কাঁদিলা গগন

(খ) এতো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি—

নিশ্চয়—উপমানকে গোপন রেখে বা নিষিদ্ধ করে উপমেয়ের প্রাধান্য স্থাপন করলে হয় নিশ্চয় অলঙ্কার। দেখা যাচ্ছে নিশ্চয় অলঙ্কার অপহ্নুতির ঠিক বিপরীত।

অসীম নীরদ নয়
ওই গিরি হিমালয়

প্রতীপ—প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয় কিংবা উপমেয়কে উপমান ধরে সাদৃশ্য কল্পনা করলে অথবা প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলত্ব প্রমাণ করলে প্রতীপ অলঙ্কার হয়।

তোমার আনন সম পূর্ণিমার চাঁদ
উজ্জ্বল করেছে ওই কেশসম অন্ধকার রাত

বিরোধাভাস—দুটি বস্তুর মধ্যে যদি আপাতঃ বিরোধ দেখা যায় এবং সেই বিরোধ দেখানোর ফলে যদি কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টি হয় তাহলেই বিরোধাভাস অলঙ্কার হবে।

(ক) রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন

(খ) পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ

বিষম—

(ক) কার্য ও কারণের গুণ বা ক্রিয়ার বৈষম্য ঘটলে, (খ) আরব্ধ কার্যের নিষ্ফলতা ঘটলে কিংবা (গ) বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সম্মেলন ঘটলে বিষম অলঙ্কার হয়।

(ক) দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে।
গলে পর মুণ্ড মালা পরের ছেলের মাথা কেটে॥

(খ) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল

(গ) তখন মনে হইতেছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

বিভাবনা—কারণ ছাড়া কার্যোৎপত্তি ঘটলে হয় বিভাবনা অলঙ্কার।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বা'তে নিবে গেল মঙ্গল প্রদীপ

বিশেষোক্তি—বিভাবনার বিপরীত। কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি না ঘটলে হয় বিশেষোক্তি অলঙ্কার।

মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয় নিয়ত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক।

অসঙ্গতি—

কার্য ও কারণ যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে তাহলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়—

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে হবে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার—

(ক) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ (স্তুতিচ্ছলে নিন্দা)

(খ) অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি)

অনুশীলনী

(১) ভাষার অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত অলঙ্কার কয় প্রকার? অলঙ্কারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও। (ক. বি.—বি. টি. ১৯৪৬)

(২) ভাষায় অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় কেন? শব্দালঙ্কারের ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য কি? শব্দালঙ্কারের প্রকার ভেদ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। (ক. বি.—বি. টি. ১৯৪৮)

(৩) দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ও বক্রোক্তি বুঝাইয়া দাও। (ক. বি.—বি. টি. ১৯৪৯)

(৪) শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পড়াইতে গেলে অলঙ্কারের অর্থ কি করিয়া বুঝাইতে হয়? দুইটি শব্দালঙ্কার ও দুইটি অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।
(ক. বি.—বি. টি. ১৯৫০)

(৫) অলঙ্কার কি কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য? (ক. বি.—বি. টি. ১৯৫১)

(৬) "বিসদৃশ পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে পারেন একমাত্র কবি দার্শনিক অলঙ্কারের প্রতিভা।" অন্ততঃ তিন প্রকার অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগের সাহায্যে এই উক্তিটির সত্যতা প্রতিপন্ন কর— (ক. বি.—বি. টি. ১৯৫৩)

(৭) কাব্যে অলঙ্কারের উপযোগিতা কতখানি? প্রাচীন রূপ বর্ণনায় ব্যবহার করিতেন এমন অন্ততঃ তিনটি অলঙ্কারের পার্থক্য কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা যমক, শ্লেষ, উপমা ও রূপক বুঝাইয়া দাও।
(ক. বি.—বি. টি. ১৯৫৫)

পাঠটীকা—কি ও কেন ?

লেসন্ প্ল্যান বা পাঠটীকা বস্তুটি কি বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়—সমর-কুশলী সেনাপতির কাছে যেমন রণক্ষেত্রের নক্সা, পাকা বাস্তুকারের কাছে যেমন নির্মীয়মান গৃহের নক্সা, সার্থক শিক্ষকের কাছেও তেমনি প্রদেয় পাঠের নক্সা। মনের মধ্যে ভাবী কাজের একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে কাজ কখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সুতরাং কোন শ্রেণীতে কোন একটা পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক মনে মনে পাঠ-পরিচালনার যে পরিকল্পনাটি তৈরী করে নেবেন, সেইটেই হ'ল তাঁর লেসন নোট বা পাঠটীকা। এ ছাড়া উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনদিকে তাঁর এগোনই সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য—

সৃষ্টিধর্মী কাজ মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে—সুতরাং শ্রেণীতে আমরা যখন পাঠদান করতে যাব তখন মনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই থাকবে। এবং সেই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

'উদ্দেশ্য' কথাটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। সব পাঠদানের উদ্দেশ্যই ত বিদ্যাদান কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখলে তার মধ্যে তারতম্য আছে। বিষয়ভেদে এবং শ্রেণীভেদে এই উদ্দেশ্যের ইতর-বিশেষ ঘটবে না কি ? সকল পঠিতব্য বিষয়গুলিকেই আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়গুলি জ্ঞানমূলক— তত্ত্ব ও তথ্য এই হ'ল এর মূলকথা। কিন্তু সাহিত্য ? সেখানে ত রসানুভূতিটাই চরম কথা। সুতরাং সাহিত্যের পাঠদানের প্রসঙ্গে যদি আমরা রসানুভূতিরই প্রাধান্য দিই তাহলে এমনভাবে পাঠ পরিচালনা করতে হবে যাতে ব্যাকরণের কচকচি এসে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত না ঘটায়। ব্যাকরণ শেখানর জন্য স্বতন্ত্র পাঠ দেব কিন্তু কাব্য পাঠের রসাভাস ঘটাতে অবশ্যই দেব না।

এইভাবে পাঠটীকায় পাঠদানের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে প্রথমেই।

এরপর কিছু পাঠদান-সহায়ক উপকরণের উল্লেখ করতে হয়।

উপকরণ—শিশু মনকে পাঠের দিকে আকৃষ্ট করতে হ'লে অথবা বিমূর্ত বিষয়গুলিকে মূর্ত করে তুলতে হ'লে অনেক সময় ছবি, অনুকৃতি (model , নক্সা ইত্যাদি দেখাতে পারলে ভাল।

মনোবিদেরা বলেন, পাঠ কেবলমাত্র. শ্রুতি-নির্ভর না ক'রে যত অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়-নির্ভর করা যায় ততই পাঠদান সার্থক হয়। সেই দিক থেকেও পাঠের প্রদীপন হিসাবে কিছু উপকরণ নিয়ে যেতে পারলে ভাল। কোন্ পাঠে কি কি উপকরণ লাগতে পারে শিক্ষক আগে থেকে স্থির ক'রে না রাখলে যথাসময়ে তা কি করে পাবেন ? অবশ্য এই উপকরণ বিষয়ভেদে ও শ্রেণীভেদে উপকরণবাহুল্য না করলেও চলবে।

আয়োজন—

এর পর হচ্ছে পাঠটীকার সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—আয়োজন। এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গেলে শিশুমনস্তত্ত্বে হার্বার্টীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১ টা কথা বলা দরকার, কারণ হার্বার্টীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই বর্তমানের ত্রি-.সাপানিক (পঞ্চ সোপানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) পাঠটীকার উদ্ভব ঘটেছে।

হার্বার্ট বলেন. আমাদের যখন কোন অভিজ্ঞতা ঘটে তখন তার একটা অস্পষ্ট ছাপ আমাদের মনের মধ্যে :থেকে যায় ! হার্বার্ট এই অস্পষ্ট ছাপের নাম দিয়েছেন এন্‌গ্রাম্ (Engram)। শুধু তাই নয়, নানা প্রকারের এন্‌-গ্রামগুলি পরস্পর জোড়া তাড়া লেগে নতুন নতুন ছবি আমা.দর মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে এবং এই নতুন ছবিগুলির নাম দিয়েছেন তিনি "এপারসেপটিভ্ মাস্" (Apperceptive Mass) অথবা "এনগ্রাম কমপ্লেক্স্" (Engram Complex)। বাংলায় এদের বলা হয় ভাবজট বা ছাপজট।

শিশুমনের এই 'ভাবজট-বৃত্তির' সহায়তায় শিশু পুরাতনের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে থাকবে—জানা থেকে অজানায় যাবে অর্থাৎ শিশুকে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে হবে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। যা' ঘটে গিয়েছে অর্থাৎ শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব বস্তুর ছাপ বা ভাবজট আছে তারই মাধ্যমে, তারই সহায়তায় নতুন বস্তুর অবতারণা করতে হবে, তবেই শিশুমন তাকে গ্রহণ করবে, নচেৎ নয়।

সুতরাং নতুন কিছু বিষয় পাঠদান করতে গেলেই প্রথমেই শিক্ষার্থীর মনের পুরাতন ভাবজটের (Engram Complex) সন্ধান নিতে হবে। কিন্তু কি করে তা করা যায় ?

নানাবিধ প্রশ্ন করে, নানাপ্রকার কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনার সাহায্যে ছাত্রের মনের সেই ভাবজটটি জাগ্রত করতে হবে, পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিধিটি জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে পঠনীয় বিষয়ের কোন অংশটুকু অথবা পাঠ্যের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত কোন্ বিষয়টুকু ছাত্রের পরিচিত।

মোটকথা—শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারার একটা সাধারণ অংশ নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে সর্বাগ্রে। তারপরে তাকেই ভিত্তি ক'রে চলবে নতুন পাঠদান প্রক্রিয়া।

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত—কত বিষয় ছাত্রেরা পড়ে।

প্রত্যেকটি বিষয়ের আনুসঙ্গিক ভাবজট জাগ্রত করবার বা সাধারণ অংশ আবিষ্কার করবার কৌশলটির মধ্যে সার্থক শিক্ষকের কৃতিত্ব নিহিত। তাছাড়া কোন নতুন বিষয় পড়ান আরম্ভ করবার পূর্বে ছাত্রের মনে যদি সে বিষয়ে কৌতুহল জাগান না যায় তাহলে কোন শ্রমই কাজে লাগে না। লোহা না তাতালে কি তাতে নতুন ছাপ নেয়? অ-ক্ষুধার উপর খেলে যেমন কোন বস্তুই গায়ে লাগে না, আগ্রহ না জাগিয়ে শেখালেও তেমনি তা মন লাগে না। তাছাড়া বর্তমান পাঠদান পদ্ধতিতে ৪৫ মিঃ অন্তর যে ভাবে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে, তাতে নতুন-পড়া আরম্ভ করার পূর্বে এইভাবে প্রাথমিক প্রস্তুতিকরণও অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে ছাত্রের মনে যেন 'পরীক্ষা দিচ্চি' এমন মনোভাবের সৃষ্টি না হয়—তাহলে শিক্ষক ও ছাত্রের মনের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদানের গতিটা একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে,—অথচ এইটেই হ'ল পাঠদানের প্রাণবস্তু।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন—ছাত্রেরা কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত জানে না শিক্ষক আজ তাকে কোন দিকে নিয়ে চলেছেন। শিক্ষক নানাবিধ কৌতুককর প্রশ্ন ক'রে ধীরে ধীরে ছাত্রের মনকে অদ্যকার পাঠাভিমুখে নিয়ে চলেছেন—অতি কৌশলে, অতি সন্তর্পণে।

পাঠঘোষণা—

অতঃপর ছাত্রের যখন অদ্যকার পাঠ-বিষয়ে যথোচিত আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে, তখনই শিক্ষক সকলের কাছে প্রকাশ্যভাবে পাঠঘোষণা করবেন, অর্থাৎ তিনি আজ কতটুকু কি পড়াবেন তা বলবেন। পাঠঘোষণার পর

আরম্ভ হবে দ্বিতীয় সোপান বা অন্তকার পাঠ উপস্থাপন। এখান থেকেই হ'ল পড়ান শুরু আর প্রথম সোপান হল তার ভূমিকা।

উপস্থাপন—

আগেই বলেছি পাঠ দুই জাতের—জ্ঞানমুখী আর ভাবমুখী। সুতরাং তাদের উপস্থাপনাও হবে দুই প্রণালীর। জ্ঞানমুখী পাঠের পাঠটীকায় উপস্থাপনা অংশ দু'ভাগে বিভক্ত—বিষয় ও পদ্ধতি। অর্থাৎ একভাগে বলা হবে কি বিষয় পড়াব এবং অপর ভাগে বলা হবে কি পদ্ধতিতে পড়াব। বিষয়বস্তু ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করার সময় সমগ্র পাঠ্য বিষয়টিকে এমন কয়েকটি খণ্ডে ভাগ ক'রে নিতে হবে যে ভাবের দিক থেকে সেগুলি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন খণ্ডগুলির মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে! তারপর সেই বিষয়গুলির পাশে পাশে এমন কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ রচনা করতে হবে যে, তার উত্তর দেবার প্রসঙ্গেই পাঠ্য বিষয়টি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে। প্রশ্নের উত্তর কতটুকু ছাত্র বলবে আর কতটুকু শিক্ষক ব'লে দেবেন সেটা নির্ভর করবে ছাত্রের জ্ঞানের পরিধির উপরে এবং শিক্ষকের প্রশ্ন রচনার কৌশলের উপরে।

ভাবমুখী বিষয় অর্থাৎ সাহিত্যাদি পাঠের সময় আর উপস্থাপনা অংশ বিভক্ত করার দরকার নেই। প্রাধান্য সেখানে বিষয়বস্তুর নয়, রসবস্তুর। তাই সেখানে আদর্শ পাঠের মূল্য অনেক বেশী। অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দ যতি তাল সহযোগে একটি ভাল কবিতার যদি রস-সঞ্চারী পাঠ দেওয়া যায় তাহ'লে ছাত্রের মনে যতখানি গভীরভাবে রেখাপাত করবে, কবির সঙ্গে কাব্যপাঠকের মনের যে সাহিত্য বা সহযোগ সৃষ্টি করবে, তা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই হওয়া সম্ভব নয়।

এই অংশে যে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে তাও কাব্যের মর্মোপলব্ধি, রস-গ্রহণ ও শিল্প-নৈপুণ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। প্রয়োজন-বোধে কাব্যিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভাবসমৃদ্ধ কবিতাংশ উল্লেখ করাও চলতে পারে।

ভাষা ও সাহিত্য পঠন পাঠনার মধ্যেও এই দুই জাতের পাঠই আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের কথাই ধরা যাক। ব্যাকরণ, অনুবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে আমরা জ্ঞানমুখী পাঠের অন্তর্গত বলে ধরতে পারি আর সাহিত্য অর্থাৎ গদ্য পদ্য পাঠ সম্পূর্ণভাবেই ভাবমুখী। এর আবেদন মস্তিষ্কের বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের অনুভূতির কাছে। জ্ঞানদান এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য

হল আনন্দদান সুতরাং এর পাঠদান-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা নয়, রসগ্রহণে সাহায্য করা, কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাহিত্য অর্থাৎ সহযোগ স্থাপন করা, পাঠটিকা প্রস্তুত করবার সময় এই মূল উদ্দেশ্যটি সব সময়ে মনের মধ্যে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখতে হবে। পাঠদানের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে এই কথা ইতিপূর্বেই বলেছি।

এই উদ্দেশ্যই রূপায়িত হবে উপস্থাপন পর্যায়ে। কি ভাবে এই কার্যটি সার্থক ভাবে করা যায় সেইটি এইবার আলোচনা করব।

প্রথমেই প্রদেয় পাঠ্যাংশটুকুর একটি রসগ্রাহী আদর্শ পাঠ দেবেন শিক্ষক। এখানে একটা প্রশ্ন হয় শিক্ষক কতটুকু পড়াবেন, অদ্যকার পাঠ্যাংশটুকু, না পুরা রচনাটি। কেউ কেউ বলেন পুরা রচনা থেকে সামান্য একটু অংশ মাত্র পাঠ করলে রস-নির্মিত হবে কেমন করে? ছাত্রের মনে একটা অতৃপ্তিকর কৌতূহল থেকে যাবে, যার ফলে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটবে। কথাটা সত্য কিন্তু সুদীর্ঘ কবিতা, বিশেষতঃ দীর্ঘ গদ্য প্রবন্ধ একটানা পড়ে যাবার সময় কোথায়? তাতে শুধু পাঠই হবে, সম্যক পঠনের সুযোগ থাকবে না, এবং দীর্ঘতার দরুণ অনেক সময় পাঠ ক্লান্তিকরও হতে পারে। সুতরাং মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। ছোট খাট কবিতা হলে প্রথম পাঠে সমগ্র কবিতাটি পড়ে দেওয়াই ভাল, যদিও সেটিকে ২।৩ দিনের পাঠের বিষয়ীভূত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ কবিতা বা প্রবন্ধ হলে তাকে ভাবের দিক থেকে কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে তার একটি খণ্ড পড়া যেতে পারে। যাই হোক সেটি সময় ও বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক ঠিক করে নেবেন।

আদর্শ পাঠের পরে সেই পাঠ ছাত্রেরা ঠিক মত শুনেছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য এইবার শিক্ষক ২।৩টি স্থূল প্রশ্ন করবেন। এই প্রশ্ন কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক হবে না, পঠিত ঘটনামাত্র অবলম্বনে এই প্রশ্ন রচিত হবে—এই জাতীয় প্রশ্নে অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী হতে সাহায্য করবে। এর পর হবে কাব্যের বা প্রবন্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তার জন্য শিক্ষক প্রদেয় পাঠ্যাংশটুকুকে আরো কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি খণ্ডের পূর্বরূপ আদর্শ পাঠ দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করবেন। এই সব প্রশ্নের মাধ্যমেই শিক্ষক পাঠের মর্মার্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, কঠিন শব্দার্থ প্রভৃতি উপস্থাপন করতে পারেন। (দৃষ্টান্ত হিসাবে শেষে কয়েকটি পাঠটীকার নমুনা দেওয়া হল) শব্দার্থ জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে একটি

কথা স্মরণ রাখতে হবে। অযথা শব্দার্থ ও ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্নের বাহুল্যে যেন কবিতার রসমাধুর্য নষ্ট না হয়ে যায়। তাছাড়া শব্দার্থের জন্ত শব্দগুলিকে বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করতে নেই। শব্দকে সব সময়ে বাক্যের পটভূমিতে রেখে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে হয়। "তবে মিছে সহকার শাখা তবে মিছে মঙ্গল কলস—" পড়াতে গিয়ে সহকার শব্দের মানে কি'—এইভাবে প্রশ্ন করা অপেক্ষা 'মিছে-সহকার শাখা'—বলতে কবি এখানে কি বুঝিয়েচেন?—এই প্রশ্ন করা ভাল। শব্দ কখনই আমাদের সামনে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসেনা—বাক্যের মাধ্যমেই আসে। কিন্তু অর্থবোধের সময় তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে না বুঝে মুখস্থ করাই (cramming) উৎসাহিত হয়।

এইভাবে পাঠ্যাংশটির সমুদয় অর্থ তাৎপর্য এবং মর্ম সম্বন্ধে ছাত্রের ধারণা স্পষ্ট হলে পর তাদের পড়তে দিতে হয়।

কেউ কেউ বলেন ছাত্রের পাঠ শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পরেই হওয়া উচিত। কারণ শিক্ষকের পাঠ কৌশল শুনবার অব্যবহিত পরে পড়লে ছাত্র শিক্ষকের পাঠকে ভালভাবে অনুসরণ করতে পারবে। কিন্তু এই মত মনস্তত্ত্ব-সম্মত বলে মনে হয় না। শিক্ষক প্রথমে আদর্শ পাঠের দ্বারা সাহিত্যের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করলেন মাত্র। তখনও তার মধ্যে অনেক অজানা শব্দ অজানা ভাব অজ্ঞাত বাক ভণিতি থেকে গিয়েছে, বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ ছবিটি তখনও ছাত্রের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থায় পাঠের মধ্যে কখনই স্বতঃস্ফূর্ত রস সঞ্চার হতে পারেনা, ছন্দ যতি তালের স্বাভাবিক বিন্যাসও তখন আমরা কখনও আশা করতে পারিনা ছাত্রের কাছ থেকে। এই অবস্থায় ছাত্রের পাঠ হবে একান্ত অনুকরণ-নির্ভর। অভিনয়ে স্মারকের (prompter) কথার উপর মাত্র নির্ভর করে পার্ট বলে গেলে সে পার্ট যেমন প্রাণহীন কৃত্রিম হয়, শিক্ষকের আদর্শ পাঠ নকল করে পাঠ করলেও হয় তেমনি প্রাণহীন কৃত্রিম। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্রটি মনের মধ্যে যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন সেই পাঠ হবে স্বাভাবিক, স্বতোৎসারিত। শিক্ষক ত ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার পাঠ দিলেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ত আদর্শ পাঠ চলছেই এবং ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ পাঠের স্বরবৈচিত্র্য ও ছন্দযতির বিন্যাস ছাত্রের মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই স্তরেই ছাত্রের পাঠ যে সমধিক কার্যকরী সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ছাত্রের পাঠের পরে এবং অভিযোজনের পূর্বে শিক্ষক পাঠ্যাংশটির আর

একটি আদর্শ পাঠ দিলে ভাল হয়। গদ্য পাঠের বেলায় এটা হয়ত সম্ভব হবে না তবে কবিতা পাঠের বেলায় অবশ্যকরণীয়। এর কারণ আছে—

আগেই বলেছি, সাহিত্য পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টি এবং ছাত্রদের সেই কাব্যামৃত রসাস্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করতে গিয়ে কাব্যের অর্থ ব্যাখ্যা তাৎপর্য নিয়ে এমন অনেক আলোচনা এতক্ষণ ধরে করতে হয়েছে যার ফলে কাব্যের সেই রসমূর্তি অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে—রসাস্বাদন অনেকটা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। সুতরাং কবিতাটি পুনরায় আদর্শ পাঠ দিয়ে শ্রেণীকক্ষে রসপরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কবিই হলেন কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—কাব্যের মাধ্যমে কবি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন কোন টীকাকারই তা পারবেন না, তাই কাব্যের আদর্শ পাঠ এত প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষক একাধিকবার কবিতাটির রসগ্রাহী পাঠ দিতে পারেন—তবে বারংবার মামুলি পাঠের দ্বারা শ্রেণীকক্ষে যেন একঘেয়েমির সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বোর্ডের কাজ—

পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে চলবে বোর্ডের কাজ। ছাত্রদের কাছ থেকে নিষ্কাশিত উত্তরগুলি শিক্ষক আরো মার্জিত এবং সংক্ষিপ্ত করে বোর্ডে লিখে দেবেন অর্থাৎ ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষক সেই দিনকার পাঠের সংক্ষিপ্ত সারটি বোর্ডে লিখে দেবেন পাঠের গতি অনুসরণ ক'রে। সাহিত্যপাঠে বোর্ডের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু তুলনীয় কবিতা লিখে দেওয়া যেতে পারে। অথবা কিছু কিছু দুরূহ শব্দ থাকলে ছাত্রের সহযোগিতায় তার উত্তর লিখে দেওয়া ভাল। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠের রসানুভূতির উদ্দেশ্যটি যেন শব্দার্থ ও ব্যাকরণের ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে না যায়।

দ্রুত পঠনের বেলায় গল্পের মূল বিষয়টি কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে প্রত্যেক খণ্ডের শিরোনামা লিখে দিতে হয়—তাতে ছাত্রের পক্ষে গল্পের কাহিনীকে অনুসরণ করা সহজ হয়।

রচনা লেখাতেও বিষয়বস্তুর কয়েকটি সঙ্কেত বোর্ডে লিখে দিলে রচনা লেখার পক্ষে সুবিধা হয়।

ব্যাকরণ শেখাতে বোর্ডের সাহায্য ত অপরিহার্য, অবরোহ পদ্ধতিতে সূত্র নিষ্কাষণ করতে হয়।

অভিযোজন

এইভাবে পাঠদান শেষ হয়ে গেলে আমরা পাঠটীকায় তৃতীয় সোপান বা শেষ সোপানে উপনীত হলাম। এর নাম অভিযোজন (Application)—এই অংশে দেখতে হবে ছাত্র এতক্ষণ ধরে যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ তার দ্বারা সম্ভব কিনা। যে অংশ তারা শিখল, তারই সাহায্যে যে অংশ তখনও শেখেনি তাতে কিছু আলোকপাত করতে পারে কিনা।

প্রয়োগকৌশল না শিখলে জ্ঞানের ত কোন মূল্যই নেই। নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অর্জিত-জ্ঞানের যদি কোন সাহায্য আমরা না পাই, তবে সে জাতীয় জ্ঞানের মূল্য কী? সুতরাং এই অংশে এমন কতকগুলি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করতে হবে যার সাহায্যে ছাত্রের জ্ঞানের ও রসানুভূতির এই অভিযোজন ক্ষমতা যেন আমরা বুঝতে পারি।

বাড়ীর কাজ

পরিশেষে কিছু বাড়ীর কাজ উল্লেখ ক'রেই পাঠটীকার কাজ শেষ। বাড়ীর কাজ অবশ্য এমন কিছু হবে না, যাতে ছাত্রের বিরক্তি উৎপাদন করে। বুদ্ধির পরিচয়, আগ্রহের পরিচয়, রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এমন কিছু সুনির্বাচিত হাল্কা কাজ দিতে হবে।

মোটকথা পাঠ-পরিকল্পনার প্রধান তিনটি অংশ—প্রথমে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে হবে, রসানুভূতির সঞ্চার করতে হবে অর্থাৎ ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আগ্রহান্বিত মনে নূতন পাঠের রস পরিবেশন করতে হবে অর্থাৎ কর্ষিত ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের বা রসানুভূতির বীজ বপন করতে হবে।

পরিশেষে তৃতীয় পর্যায়ে পরিবেশিত রস' চিত্ত কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে, নূতন জ্ঞানে হৃদয়ের ভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ উৎপন্ন ফসল কতটা গৃহজাত হ'ল তারও খবর নিতে হবে।

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'লে এই প্রণালীতে পাঠদানের কাজ যে অনেক বেশী ভালভাবে সার্থকভাবে এবং আনন্দিতভাবে নির্বাহ হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের স্থান—

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সেনাপতির কাছে সমরক্ষেত্রের নক্সার মতই শিক্ষকের কাছে পাঠটীকার মূল্য। উপমাটা আরো একটু ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাক। যুদ্ধের নক্সার সঙ্গে যদি পাঠটীকার তুলনা করতে হয়, তাহলে সুসজ্জিত সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে তুলনা করা চলে প্রশ্নাবলীর। সৈন্যরা যেমন সুকৌশলে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ জয় করে, পাঠও পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে যায় প্রশ্নের সাহায্যে। সৈন্যের রণচাতুর্য ও বীরত্বের উপরে যেমন যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে, তেমনি ভালমন্দ প্রশ্ন নির্বাচনের উপরেই পাঠের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে।

সুতরাং পাঠটীকা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন নির্বাচন ও প্রশ্ন করবার কৌশল আলোচনা করা দরকার। কারণ ভাল প্রশ্ন করতে না জানলে কখনও ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না (a bad questioner is a bad teacher—David Salmon),

প্রশ্ন করি কেন?—

প্রথমেই দেখা দরকার প্রশ্ন করি কেন অর্থাৎ পাঠপরিচালনায় প্রশ্নের স্থান কোথায়? আমরা সাধারণতঃ প্রশ্ন ক'রে পড়া ধরি—পাঠ্যবস্তু কতখানি আয়ত্ত হয়েছে তাই পরীক্ষা করবার জন্যে—কিন্তু প্রশ্নের উদ্দেশ্য তা মোটেই হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন করবার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখতে পারি। যথা—

[১] ছাত্র কতটা শিখেছে তা তার নিজেরই বুঝবার জন্য।

[২] ছাত্র কতটা শিখেছে তা অপরকে দেখাবার জন্য।

[৩] ছাত্র শিক্ষককে কতটা অনুসরণ করতে পেরেছে তা বুঝবার জন্য।

[৪] ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে আরো উদ্বোধিত করার জন্য।

[৫] ইতিপূর্বে যা শেখা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির জন্য।

[৬] যতখানি পাঠদান করা হ'ল তার কতটা কাজে লাগল তা বুঝবার জন্য।

[৭] ছাত্রের মনে নূতন পাঠের প্রতি আগ্রহ জাগাবার জন্য।

[৮] ছাত্রের অমনোযোগ প্রতিরোধের জন্য। এবং

[৯] ছাত্রের আত্মপ্রবঞ্চনা প্রতিরোধের জন্য।

এই কারণগুলিকে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবার দরকার আছে বলে মনে

হয় না। ছাত্রের মনে অন্ধকারময় গোপন মণিকোঠার সন্ধান ত শিক্ষককে এই প্রশ্নের বাতি জেলেই নিতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য প্রশ্নও হবে বিভিন্ন ধরনের সুতরাং প্রয়োজনানুরূপে প্রশ্ন তৈরী করা একটা মস্তবড় জটিল সমস্যা ও সুনিপুণ শিল্পকার্য। প্রত্যেক শিল্পকার্যেরই যেমন একটা নিয়ম শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে, প্রশ্নগঠন কার্যেরও তেমনি গড়ে উঠেছে একটা বিধিনিয়ম। বহু শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ত্ববিদের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ক'রেই এইসব বিধিনিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো রচিত হয়েছে। সুতরাং অনভিজ্ঞ নূতন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পক্ষে প্রশ্ন নির্মাণের এই নিয়মশৃঙ্খলার মূল সূত্রগুলি জানা একান্ত আবশ্যক।

পাঠটীকা যেমন তিনখণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডের প্রশ্নও হবে তেমনি তিনটি বিভিন্ন জাতের। ১ম—আগ্রহ উদ্দীপক প্রশ্ন (Thought provoking questions) ২য়—পাঠ পরিণতিমূলক প্রশ্ন। (Developing questions) ৩য়—পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing questions).

এরপর আলোচনা করি প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে—

(১) প্রশ্নের ভাষা সহজ, সরল ও সুনির্বাচিত শব্দের দ্বারা গঠিত হওয়া চাই—বাক্য যত ছোট হয় ততই ভাল। একটা দৃষ্টান্ত দিই—"তোমাদের মধ্যে কোন ছেলে যদি এই গ্রীষ্মের ছুটির শেষের দিকে এখান থেকে বহুদূরে এমন এক পল্লীগ্রামে যাও যেখানে সবুজ মাঠের ধারে ধারে কাদা আর তার নীচেই ঘোলা জলের ডোবা, আর সেখানে গিয়ে যদি তোমরা খেয়াল খুসি মত ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাক তাহলে একজাতীয় ছোট ছোট জীবকে লাফিয়ে লাফিয়ে জলে পড়তে দেখবে। বলত সেই জীবগুলি কি?"—ব্যাঙের কথা বলতে গিয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলেই হয়েছে আর কি।

অথবা "প্রাবৃটকালে মার্তণ্ডের প্রচণ্ডতা থাকে না কেন?"—বাক্য ছোট হ'লে কি হয়, শব্দের হুঙ্কারেই ছাত্রের দফা শেষ হবে। বলাই বাহুল্য এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অচল।

(২) প্রশ্নের ভাষা যতদূর সম্ভব পাঠ্য পুস্তকের ভাষাকে অনুসরণ না করে চলাই উচিত। বইয়ের ভাষায় প্রশ্ন করলে উত্তর সাধারণতঃ বইয়ের ভাষাতেই দেবে ছেলেরা—তাতে তাদের চিন্তাশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না। হুবহু বইয়ের কথা দিয়ে কখনও প্রশ্ন করতে নেই—যথা—"ইংলণ্ডে চা উৎপন্ন হয় না"—কেন হয় না?—"তুন্দ্রাবাসী এস্কিমোরা যাযাবর"—কারা যাযাবর? এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষকেরও চিন্তাশীলতার কোন প্রমাণ নেই।

(৩) প্রশ্নের সময় ঠিক প্রশ্ন ছাড়া অযথা বাক্য-বিন্যাস করা উচিত নয়— "আচ্ছা দেখি ত তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে—"অথবা "এই কথাটির জবাব যে দিতে পারবে, বুঝব সে ভাল পড়া করেছে—" এই জাতীয় প্রশ্নের ভুমিকায় ছাত্রের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে।

(৪) প্রশ্ন হবে সুস্পষ্ট এবং একটি নির্দিষ্ট উত্তরের প্রতি কেন্দ্রীভূত। "পলাশীর যুদ্ধের পর কি ঘটেছিল?" অথবা "নদীর জলে কি ভাসে?" এই জাতীয় অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট প্রশ্নের একাধিক উত্তর হ'তে পারে। ছাত্র বুঝতে পারে না শিক্ষক ঠিক কোন জিনিসটি চান।

(৫) বিকল্প উত্তর হ'তে পারে এমন প্রশ্ন ভাল নয়—"বাদুড়ের ডিম হয় না বাচ্চা হয়? পদ্মফুল দিনে ফোটে না রাত্রে ফোটে?" এই জাতীয় প্রশ্নে দুটো মাত্র উত্তর হতে পারে—তার মধ্যে একটি ভুল অপরটি ঠিক। এ ক্ষেত্রে ছাত্রেরা অনেক সময়ে আন্দাজে উত্তর দিয়ে বাহাদুরী নেয়।

(৬) এমন কোন প্রশ্ন করা ঠিক নয়—যার উত্তর শুধুমাত্র হাঁ বা না দিয়েই দেওয়া যায়।

"তোমরা কেউ বাঘ দেখেছ? নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয় বলতে পার? তুমি কি ফুটবল খেলতে ভালবাস?"—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ছেলের একটুও চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না। আন্দাজে একটা হাঁ বা না ব'লে দিলেই হ'ল।

(৭) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তর হবে সুদীর্ঘ অর্থাৎ অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতে হবে। যথা—"আকবরের শাসন প্রণালী বর্ণনা কর" কিংবা আফ্রিকার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও"—এই বিষয়গুলিকে আরো ৫।৬টি এমন ছোট ছোট প্রশ্নে ভেঙে দেওয়া যেতে পারে যার উত্তর ২।১টি কথায় দেওয়া যায়।

(৮) পড়বার সময় যে কথাগুলো বলা হ'ল, পর মুহূর্তে সেই কথা ধরেই প্রশ্ন করা চলবে না। যেমন বলা হল "শেরশাহ প্রথম এদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেছিলেন। অমনি প্রশ্ন—কে ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন করেছিলেন? ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন—ইংলণ্ডের রাজধানীর নাম কী?" বলাই বাহুল্য এই জাতীয় প্রশ্নের কোন সার্থকতাই নেই।

(৯) শূন্যস্থান পূরণের প্রশ্ন করা চলবে না, যেমন—আমেরিকা আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে? উত্তর হ'ল—কলম্বস।

মাদ্রাজিদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে—? উত্তর হল—ভাত।

এ ধরণের প্রশ্নে ছাত্রের চিন্তাশক্তি উদ্বোধিত হয় না—যেটুকু জানে সেটুকুও গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা হয় না।

(১০) প্রশ্ন সব সময়েই পাঠ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই, নইলে ছাত্রের চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বর্ষার কবিতা পড়ান হবে, আয়োজনে বর্ষা ঋতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হল—তা থেকে অন্যান্য ঋতুর কথা—তা থেকে বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক বর্ণনা—এইভাবে অযথা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ান্তরে চলে গেলে পাঠ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে।

(১১) প্রশ্নের মধ্যে কিছু কিছু ভাষার বৈচিত্র্য আনা দরকার। অনেক সময় একটা প্রশ্নই ২।৩ বার করার দরকার হতে পারে—সে ক্ষেত্রে একই ভাষা ব্যবহার না ক'রে বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ সিরাজদ্দৌল্লাকে পরাজিত করেন—প্রশ্ন করা যায়—(i) ক্লাইভ সিরাজকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করেন? (ii) ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন? (iii) সিরাজকে কে পরাজিত করেন? (iv) কার হাতে সিরাজের পরাজয় ঘটল? এইভাবে একই প্রশ্ন নানাভাবে ঘুরিয়ে করা যায়। তাতে প্রশ্নের একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(১২) কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর একই ভাষায় ঐ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করা ঠিক নয়—তাহ'লে ছেলেরা শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতি সব সময়ে সমান মনোযোগ দেবে না—কারণ তারা জানে যে শিক্ষক ওটি ২।৩ বার বলবেন।

(১৩) এমন প্রশ্ন করা ঠিক নয় যার উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই থেকে গিয়েছে যথা—চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত দেশের বন্ধু সেইজন্য দেশবাসী তাঁকে কি নাম দিয়েছিল? –এ জাতীয় প্রশ্ন কোন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না।

(১৪) প্রশ্ন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—শিক্ষক প্রশ্নগুলি এমন মধুরভাবে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে করবেন যে, ছাত্রদের উত্তর দেবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ জাগবে। আদালতে জেরা করার মত যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত না হয় ক্লাশ।

এইবার প্রশ্নগুলি কিভাবে করা হবে সেই সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করি।

(১) প্রশ্ন কখনই কোন ছাত্রবিশেষকে উল্লেখ ক'রে করা হবে না—প্রশ্ন করা হবে সমস্ত ক্লাশকে—সম্ভাব্য উত্তর সম্বন্ধে সকলেই ভাববে। তারপর যারা পারবে তাদের হাত তুলতে ব'লে তার মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসা করবেন।

(২) প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করবেন না—ভাববার একটু সময় দিতে হবে।

(৩) প্রশ্ন সব সময়ে হাত-তোলা ছেলেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখবেন না, হাত-না-তোলার মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন।

(৪) প্রশ্ন কখনও পর পর ছেলেদের ধরে যাবেন না—সামনে পিছনে আশে পাশে অর্থাৎ সারা ক্লাশে প্রশ্ন ছিটিয়ে দেবেন।

(৫) ক্লাশে পাঠ পরিচালনার সময় চেয়ারে বসে বা টেবিলে ঝুঁকে থাকবেন না—এক জায়গায় কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েও নয়, আবার সারা ঘর পায়চারি করেও বেড়াবেন না। মোটকথা বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলাফেরা করবেন। অনেকে পড়াতে পড়াতে বেঞ্চের পাশ দিয়ে ক্লাশের শেষ পর্যন্ত চলে যান। এটা কখনও উচিত নয়। ভেবে দেখবেন সমস্ত ছেলের দৃষ্টি আপনার দিকে—আপনি যদি ক্লাশের পিছনে চলে যান তাহলে সব ছেলের চোখ ঘুরে যাবে পিছন দিকে…ক্লাশের মনোযোগ ব্যাহত হবে।

(৬) অনেকে ক্লাশের দিকে পিছন ফিরে অনেকক্ষণ ধরে বোর্ডে লিখে যাচ্ছেন—এটা ভাল নয়। প্রথমতঃ বোর্ডটা এমন ভাবে বসাতে হবে—যাতে লিখবার সময় শিক্ষককে একেবারে পিছন ফিরতে না হয়। তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে কিছু লেখা ভাল নয়। অল্প অল্প ক'রে লিখতে হয়।

(৭) একসঙ্গে একাধিক ছেলের উত্তর দেওয়া চলবে না—শিক্ষক সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন।

(৮) ক্লাশে গিয়ে হয়ত দেখা যাবে বোর্ডে আগের ঘণ্টার পাঠ্যবিষয় লেখা রয়েছে—পড়ান হচ্ছে বাংলা কবিতা, শিক্ষক নানাভাবে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, অথচ ছাত্রদের সম্মুখেই বোর্ডভরা এলজ্যাবরার অঙ্ক কষা। এটা খুব খারাপ। শিক্ষক ক্লাশে গিয়েই বোর্ড মুছে নেবেন এবং ক্লাশের শেষে বোর্ড মুছে দিয়ে আসবেন।

(৯) আগের দিন যদি কোন গৃহকাজ দেওয়া থাকে সেটি অবশ্য দেখতে ভুলবেন না—তা না হ'লে গৃহকাজের কোন গুরুত্ব থাকবে না। খাতা ক্লাশে দেখবেন না, অবসর সময়ে দেখে এনে মনিটার মারফত ফিরিয়ে দেবেন।

(১০) ছাত্রেরা কোন ভুল উত্তর দিলে অপর ছাত্রের দ্বারা তার সংশোধনের চেষ্টা করবেন, কেউ না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। অসংশোধিত ভুল উত্তর ফেলে রেখে কখনই দ্বিতীয় প্রশ্নে যাবেন না।

(১১) ভুল উত্তর যেমন না জানার জন্য হ'তে পারে আবার তেমনি— প্রশ্নট ঠিকমত বুঝতে না পারার দরুণও হ'তে পারে। সুতরাং ভুলের কারণটি নির্ণয় করে তবেই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) কোন ছাত্র কোন ভুল বা হাস্যকর উত্তর দিলে শিক্ষক কখনই হাসবেন না বা ক্লাশে এই নিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না। এই জাতীয় উত্তরের কারণটি অতি সহানুভূতির সঙ্গে নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন।

এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে করলেই চলবে না, পাঠকের দিকেও সমভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্ন ছাত্রের বুদ্ধি, বিবেচনা ও মানসিক সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে করলে সমস্ত পাঠই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় একই কবিতা উচ্চশ্রেণীতেও পড়ান হচ্ছে, আবার নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দুই শ্রেণীতে পাঠ পরিচালনা নিশ্চয়ই একই ভাবে হয় না। ঐ কবিতাটির পাঠটীকা শ্রেণীকক্ষের বুদ্ধি-সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের হবে। এ কথা ত বলাই বাহুল্য।

এইখানে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের "দেবতা-বিদায়" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সংকলিতা ১ম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আবার ঐ কবিতাটি নবম শ্রেণীব পাঠ্য পুস্তকেও দেখা যায়। কবিতাটির শেষ চারিটি ছত্র দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করি—

ভক্ত বলে 'প্রভুমোরে কী ছল ছলিলে।'
দেবতা কহিল, 'মোরে দুর করি দিলে।—
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

ষষ্ঠ শ্রেণীতে সোজাসুজি কাহিনীমূলক প্রশ্ন করা যেতে পারে যথা :—

(১) ভক্ত কি কহিলেন ?
(২) দেবতা উত্তরে কি বলিলেন ?
(৩) ভক্ত দেবতাকে 'কী ছল ছলিলে' বলিল কেন ?
(৪) দেবতা জগতে কি ভাবে বেড়ান ?
(৫) কি জন্য তিনি বেড়ান ?
(৬) কি করিলে তিনি ঘরে থাকেন ?
(৭) গৃহহীনকে কি দিতে হয় ?

উচ্চতর শ্রেণীতে কবিতাটির তাৎপর্যমূলক প্রশ্ন করলে ভাল হয়। যথা -

(১) ভক্ত এখানে দেবতার কোন ছলনার কথা উল্লেখ করিতেছেন ?

(২) ভিখারী অকস্মাৎ দেবতার মূর্তি ধরিল, বলবার তাৎপর্য কী ?

(৩) "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"—

বিবেকানন্দের এই কবিতাটির মর্মার্থ এই কবিতায় কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ?

(৪) ভগবান জগতে দরিদ্ররূপে কি ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ?

(৫) ভগবান মানুষের হৃদয়ে দয়া চান—বলিবার উদ্দেশ্য কি ?

(৬) গৃহহীনকে গৃহ দিলে তবেই ভগবান গৃহে থাকেন এই জাতীয় একটি তুলনীয় কবিতা বল—

[তুলনীয়—অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি···তবে আজ কিসের উৎসব ? কাঙ্গালিনী, রবীন্দ্রনাথ]।

(৭) কোন সবল ভাই যদি অপর দুর্বল ভাইকে অযথা উৎপীড়ন করে তবে পিতা সেই উৎপীড়ক পুত্রকে কি ভাবে দেখেন ?

(৮) ভগবানকে যদি জগৎপিতা বলা যায় তাহা হইলে মানুষে মানুষে কি সম্বন্ধ হয় ?

(৯) মানুষ যদি মানুষকে কষ্ট দিয়া ভগবানকে পূজা করিতে বসে তাহা হইলে ভগবান কি বলিবেন ?

[তুলনীয়—তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধুপের ধোঁয়া ?]

—নজরুল

(১০) "দেবতা বিদায়" এই শিরোনামার অর্থ কি ?

(১১) প্রবীণ ভক্ত নিশিদিন দেবতার নাম জপ করা সত্ত্বেও মন্দির হইতে দেবতা বিদায় লইতেছেন কেন ?

(১২) দেবতার নাম জপ না করিয়াও কি করিলে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় ?

(১৩) প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ কি ?

মোটামুটিভাবে এই হ'ল পাঠটীকা প্রণয়নের এবং তা পরিচালনার কৌশল—এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। আমার জনৈক শিক্ষক-বন্ধু এই আলোচনাটি শুনে দুটি মন্তব্য করেছিলেন—মন্তব্য দুটি কেবলমাত্র সেই শিক্ষকবন্ধুরই নয়, অনেক পাঠকবন্ধুর মনেই জাগতে পারে—তাই সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলা দরকার।

প্রথম কথা হ'ল—বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে শিক্ষকমশাইদের দৈনিক ৫।৬ ঘণ্টা ক্লাশ নিতে হয়, যেখানে ভাল মন্দ মাঝারি ৫০।৬০ জন ছেলে এক এক শ্রেণীতে ঠাসাঠাসি ক'রে বসে আছে, যেখানে বিত্তালয়ে এক চক ডাষ্টার ছাড়া আর কোন উপকরণই পাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে বোর্ড-নির্দিষ্ট বিরাট পাঠ্যতালিকা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ ক'রে দেবার দায়িত্ব বহন করতে হয়, যেখানে পরীক্ষা প্রথায় না বুঝে মুখস্থ করার কৌশলটি যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত—সেখানে এই হার্বার্টীয় মনস্তাত্ত্বিক পাঠদান কৌশলের স্থান কোথায়, সুযোগ কোথায় এবং সার্থকতাই বা কতটুকু ?

প্রশ্নটি একান্তই প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নাই। শিক্ষাকে সুন্দর এবং সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে শিক্ষালয়ের ঘরবাড়ী, ছাত্র, শিক্ষক, পাঠ্যতালিকা, পরীক্ষা প্রণালী সব কিছুই আত্মন্ত সংস্কার করা প্রয়োজন। শুধু পাঠদান প্রণালীটি সংস্কার করলেই যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর একটা মূল্য আছে। প্রথমতঃ আমাদের আলোচনা হ'ল আদর্শ নিয়ে—আজকের দিনে অবশ্য বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের ব্যবধানটা আসমান জমিন্।

কিন্তু আদর্শের পূর্ণ চিত্রটি মনের মধ্যে না থাকলে ত কোনদিনই এই দুস্তর ব্যবধান ঘোচান সম্ভব হবে না। সংস্কারের যে অংশটুকু সরকারের হাতে বা বোর্ডের হাতে, সেটুকুর কথা ছেড়ে দিয়েও মাষ্টারমশাইদের হাতে (অবশ্য প্রধান শিক্ষক-মশাইকে ধরে) যতটুকু আছে, সেটুকুর আদর্শানুগ ব্যবস্থা করলেও ফল যে অনেকখানি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাঠটীকার খুঁটিনাটি কথা ছেড়ে দিলেও পুরাতন ও নূতন পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হ'ল পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তা, ছাত্র নীরব শ্রোতা। অথচ নূতন পদ্ধতিতে ছাত্রেরাই প্রধান বক্তা, শিক্ষক তার সহায়ক মাত্র। পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষকের অবলম্বন বক্তৃতা, নূতনে প্রশ্ন। এই দুই পদ্ধতির পার্থক্য যে কোনদিন ক্লাশে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে। সুতরাং নূতন পদ্ধতির পুরোপুরি রূপায়ন সম্ভব না হ'লেও এই মৌলিক পার্থক্যটুকু অনুশীলন ক'রে চলতে বাধা কি ? তারপর এই স্বাধীনদেশের শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে সেদিনের কি খুব দেরী আছে যেদিন শিক্ষা পরিচালনা কার্যটি সর্বদিক দিয়েই আদর্শের নিকটবর্তী হতে পারবে ?

সেদিন হয়ত আমরা আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিটি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব—তাই ব'লে আজো তা একেবারে ব্যর্থ নয়, অন্ততঃ ভাবী সার্থকতার বীজটি আজকের এই ব্যাকুলতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

দ্বিতীয় মন্তব্য হচ্ছে—এতখানি নিয়ম শৃঙ্খলা আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে গেলে

পাঠদানের স্বাচ্ছন্দ্য কি বজায় থাকবে?—পাঠদান কি যান্ত্রিক হয়ে পড়বে না?

উত্তরে একটা পাল্টা প্রশ্ন করব—সঙ্গীতের মত এমন মনোমুগ্ধকর সহজ সুন্দর সুকুমার শিল্প খুব কমই আছে অথচ তারো পিছনে রাগরাগিণী সুর তাল লয়ের এমন একটা জটিল নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে যে শুনলে মাথা ঘুরে যায়। সুললিত সাহিত্যের পিছনে আছে ব্যাকরণের কঠোর শাসন, চিত্রশিল্পের পিছনে বর্ণানুলেপনের এবং অস্থি ও শারীরতত্ত্বের অমোঘ নির্দেশ। এসব মেনে নিয়েও শিল্প তার নিজের সুষমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। সুন্দরীর অপরূপ দেহবল্লরীর অন্তরালে সুকঠিন অস্থি-সংস্থানের সার্থকতা কেউ অস্বীকার করবেন না—কিন্তু সেইটেই ত প্রকট হয়ে ওঠেনি, মাংস মেদ বর্ণ লাবণ্য দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা হয়েছে! প্রত্যেক শিল্পই ত তাই—ভিতরে রয়েছে তার কঠোর শৃঙ্খলার শাসন, বাইরে লাবণ্যের উচ্ছ্বাস। পাঠদান পদ্ধতিও একটি শিল্প—সেই শিল্পের ব্যাকরণের আলোচনাই এতক্ষণ করলাম। কারণ লাবণ্য ত শিল্পীর অন্তরের জিনিস, তার ত ব্যাখ্যা হয় না। বিভিন্ন শিক্ষক তাকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত ক'রে, সুন্দর ক'রে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলবেন। সেইখানেই তাঁর শিল্পবোধ, সেইখানেই তিনি স্রষ্টা।

সবশেষে একটা কথা বলে শেষ করি। নারীদেহের উপমা দিয়েছিলাম—অস্থি-সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা যতই থাক, আসল মূল্য কিন্তু প্রাণের। প্রাণহীন দেহের মূল্য কী?—পাঠদানের বেলাতেও তাই, নিয়ম শৃঙ্খলা যতই থাক সমস্তগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে হবে পাঠদানের মাধ্যমে। ছাত্র শিক্ষক মিলে যেখানে একাকার হয়ে গিয়েছে—পাঠ আদান প্রদানের অন্তরঙ্গতায় সমস্ত শ্রেণীটি যেখানে সজীব, সেখানে ২।১টা উপকরণের ত্রুটি বা ২।১টা প্রশ্নের ত্রুটিতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা শ্রেণীকে পাঠদানে উন্মুখ করতে হবে, জীবন্ত করতে হবে। উপরোক্ত নিয়মাবলী সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সহায়ক মাত্র, তার বেশী নয়।

অনুশীলনী

(১) পাঠদানের মধ্যে প্রশ্নের স্থান কোথায়? একই বিষয় পড়াইতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে যে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের প্রয়োজন হয়, তাহা কোন দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিপন্ন কর।

(কঃ বিঃ. বি টি, ১৯৫০)

বিভিন্ন পাঠটীকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

[পাঠটীকা সাধারণত সাধু ভাষাতেই লেখা হয়ে থাকে। তাই পাঠটীকার এই দৃষ্টান্তগুলি সাধু ভাষাতেই লেখা হল এবং ঐ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিও সাধু ভাষাতেই করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময়ে প্রশ্নগুলি যে চলিত ভাষাতেই করা হবে সেকথা অবশ্য বলা বাহুল্য]

তুলনা

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা গাহিয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশুপাখী তটিনী-তটশাখী তাহার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে পথে পল্লীজনপদে পাগল ভিখারীর সাজে
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে আসে না নগরের মাঝে।
একদা সম্রাট কহিল, "তানসেন, তোমার গুরু যেই জন
তাঁহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ, মাগি হে তাঁর দরশন।"
এতেক কহি নৃপ ছদ্মবেশ ধরি চলিল তানসেন সাথে;
শুনিল প্রাণ ভরি বিভোর হরিদাস গাহিছে একতারা হাতে।
কহিল, "তানসেন, রাগিণী তাল লয়ে অনেক গেয়েছ ত গান,
আজি যা শুনিলাম তাহার মত কই আকুল করে নাত' প্রাণ?"
কহিল তানসেন, "কাহার সাথে কার তুলনা কর হায়, ভূপ,
গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী কোথা, রুদ্ধবারি কোথা কূপ?
ভারত-ভূপ, তব আদেশমত গাই আমি এ লোকসভা মাঝে,
বিশ্বভূপালের সভায় গান তিনি, তুলনা কি তাঁর সাথে সাজে?

কালিদাস রায়

শিক্ষাগত অভীক্ষা

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর কিছু আচরণগত পরিবর্তন ঘটান। সেই আচরণগত পরিবর্তন কেমন হল কতটুকু হল সেইসব ভাল করে জানবার প্রচেষ্টাই হল পরীক্ষা গ্রহণ, অর্থাৎ এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে বা কি পরিমাণ আচরণগত পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্ধারিত করতে পারি।

নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে প্রশ্ন নির্মাণ করা সহজ নয়। পঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি কি তা আগে স্থির করে নিয়ে তদনুযায়ী প্রশ্ন রচনা করলে তবেই সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা বুঝতে পারব। কতকগুলো এলোমেলো প্রশ্ন করলে কখনই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। মাতৃভাষা পঠনের উদ্দেশ্য হিসাবে আমরা মোটামুটি করে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে দেখতে পারি—(ক) **ভাষাগত দিক** (element of language) ও (খ) **ভাবগত দিক** (ideational content)। আবার এই ভাষাগত দিককে ধ্বনি উচ্চারণ, বানান, শব্দ ভ ণ্ডার, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করতে পারা যায় এবং ভাবগত দিককে ভাগ করা যায়—ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তাৎপর্য নির্ণয়, অন্তর্নিহিত বক্তব্য বিচার প্রভৃতি অনুভূতিমূলক (appreciation) বিষয়ে।

আগেই বলেছি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন নির্মাণ করতে হয়। এবং এই সব উদ্দেশ্য সাধন (objective based questions) প্রশ্নাবলীর উৎকর্ষতা নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের উপর। যথা—**যথার্থতা** (validity), **নির্ভ'র যোগ্যতা** (reliability) এবং **নৈর্ব্যক্তিকতা** (objectivity)

লক্ষণগুলির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন—(ক) **যথার্থতা** (validity) যে বিশেষ উদ্দেশ্যটি যাচাই করবার জন্য প্রশ্ন নির্মাণ করা হল সেটি ছাড়া অন্য কোন কিছু পরিমাপের অঙ্গীভূত হলে ভুল হবে। যথা—বিশেষ কোন একটি ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিমাপ করিতে গিয়ে ভাষার ভুল, বানান ভুল, খারাপ হস্তাক্ষর ইত্যাদির জন্য যদি আমাদের মুল্যায়ণ প্রভাবিত হয় তাহলে পরিমাপক হিসাবে প্রশ্নটি ঠিক হবে না।

(খ) **নির্ভরযোগ্যতা** (reliability) যে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীর কাছে বারবার প্রযুক্ত হলেও একই ধরণের উত্তর আসবে এবং প্রাপ্ত নম্বরের কোন হেরফের হবে না তখনই সেই প্রশ্নপত্রকে নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারবে।

(গ) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (objectivity)—প্রশ্নগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনমেজাজ মর্জির পরিবর্তনে নম্বরের হেরফের হবে না। অর্থাৎ উত্তরগুলি যেই যখন দেখুক, ফল একই হবে।

প্রশ্ন সাধারণত দুই জাতের করা যেতে পারে। (ক) রচনাধর্মী (essay type) নৈর্ব্যক্তিক (objective type)। রচনাধর্মী প্রশ্ন আবার দুই ধরণের হয়—(,) দীর্ঘ উত্তর (long answer) ও সংক্ষিপ্ত উত্তর (short answer),

এই সব প্রকারের প্রশ্নের মধ্যে একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নেই উল্লিখিত তিনটি গুণ (যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা) বজায় রেখে চলা যায়। রচনাধর্মী প্রশ্নে এই তিনটি গুণেরই কমবেশী মাত্রায় অভাব ঘটে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনাধর্মী প্রশ্নের কতকগুলি সুবিধা আছে যা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে নেই। যথা—শিক্ষার্থীকে বক্তব্য বিষয় নিজের থেকে গুছিয়ে বলবার ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুভূতিমূলক মনোভাবের যে প্রকাশ ঘটে—নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে তা হওয়া সহজ নয়।

সেইজন্য সাহিত্য পাঠের পরীক্ষার্থে রচনাধর্মী প্রশ্নকে একেবারে বাদ দিতে পারি না। আজকাল তাই আদর্শ প্রশ্নপত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সঙ্গে কিছু দীর্ঘ উত্তর ও কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নও দিতে হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরী করারও কতকগুলি নিয়ম আছে। এই প্রশ্ন নানাধরণের করা যায়, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—

(i) সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন (Multiple Choice Test)
(ii) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় (True False Test)
(iii) শূন্যস্থান পূরণ (Completion Test)
(iv) সামঞ্জস্যের সন্ধান (Similarity test)
(v) উপমান অভীক্ষা (Analogy Test)
(vi) ঠিক করে সাজান (Matching Test)

এই সবই হল শিক্ষার্থীর অর্জিত কাজের পরীক্ষা বা শিক্ষাগত অভীক্ষা Achievement test)। এছাড়া আছে কারণ নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagonistic test), সম্ভাবনা নির্ধারক অভীক্ষা (Prognostic test) ইত্যাদি—

বর্তমানে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

এইবার পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণীর জন্য লিখিত কিশলয়ের কয়েকটি রচনা উপলক্ষ্য করে কিছু প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের নমুনা হিসাবে এখানে উল্লেখ করি, দীর্ঘ উত্তর বা সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক রচনাধর্মী প্রশ্ন বাহুল্যবোধে এখানে উল্লেখ করা হল না, কারণ এ জাতীয় প্রশ্ন কিশলয়ের প্রত্যেকটি রচনার শেষাংশেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয় জ্ঞান ঘটিত—

(i) **সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন** (Multiple Choice Test)

নীচের প্রশ্নগুলির চারিটি করে উত্তর দেওয়া আছে। এদের মধ্যে একটিই ঠিক বা শ্রেষ্ঠ উত্তর। সেই উত্তরটির গায়ে V চিহ্ন দাও—

(১) বুদ্ধদেবের অতীত জীবন বৃত্তান্তগুলোকে বলা হয়—

(ক) বুদ্ধজীবনী (খ) জাতকের গল্প (গ) বুদ্ধকথা (ঘ) বুদ্ধপুরাণ।

(২) কবর দস্যুরা পিরামিড লুণ্ঠন করত—

(ক) মৃতদেহগুলি চুরিকরবার জন্য (খ) রাজাদের উপর তাদের রাগ ছিল বলে (গ) মূল্যবান ধনরত্নের লোভে (ঘ) হিংস্র মনোভাবের জন্য

(৩) পুরানো দিনের জিনিসপত্র দেখে যাঁরা তার ইতিহাস রচনা করেন তাদের বলে—

(ক) ঐতিহাসিক (খ) ঔপন্যাসিক (গ) প্রত্নতত্ত্ববিদ (ঘ) ভৌগোলিক

(ii) **সত্য মিথ্যা নির্ণয়** (True False Test)—

(ক) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে একটি সত্য আর বাকিগুলো মিথ্যা। সত্যবাক্যটিতে (V) ও মিথ্যা বাক্যতে (×) চিহ্ন দাও।

(১) (ক) ডোরাক একটি ভালুকের ছানার নাম (খ) ডোরাক একটি চিতাবাঘের ছানার নাম (গ) ডোরাক একটি পাহাড়ী লোকের নাম

(২) ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন (ক) হর্ষবর্ধন (খ) প্রিয়দর্শী অশোক (গ) শাজাহান

(৩) রাজার অসুখ সারিয়ে দিয়েছিলেন (ক) চিকিৎসক (খ) সভাসদেরা (গ) এক ফকির

(iii) **শূন্য স্থান পুরণ** (Completion Test)

যথাযোগ্য শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) প্রথম মহাকাশযাত্রী হিসাবে ইতিহাসে অমর নাম – —

(খ) —— প্রাচীন জিনিসপত্রের দিকে কড়া নজর রাখেন।

(গ) কবিরের দোঁহার প্রায় একশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন—

(iv) **সামঞ্জস্যের সন্ধান** (Similarity test)

(ক) অনেকগুলি সমজাতীয় শব্দের মধ্যে থেকে একটি বিজাতীয় শব্দ চিহ্নিত কর

(১) নিকেতন, বিদ্যালয়, গৃহ, নিষ্ঠুর।

(২) ইস্তফা, কর্মত্যাগ, তাস, নাজেহাল।

(৩) পরকাল, মৃত্যু, স্বর্গীয়, চশমা।

(v) **উপমান অভীক্ষা** (Analogy test)

(১) সুখের সঙ্গে দুঃখের যে সম্বন্ধ ভালর সঙ্গে — সেই সম্বন্ধ।

(২) ছাত্রের সঙ্গে গুরুর যে সম্বন্ধ পুত্রের সঙ্গে — সেই সম্বন্ধ।

(৩) গীতাঞ্জলির সহিত রবীন্দ্রনাথের যে সম্বন্ধ দোহাগুলির সহিত —— সেই সম্বন্ধ।

(vi) **ঠিক ঠিক করে সাজান**—(Matching Test)

(১) কতকগুলি প্রশ্ন ও তাদের উত্তর এলোমেলো করে সাজান আছে, ঠিক করে সাজাতে হবে। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের নম্বরটি প্রশ্নের গায়ে লিখে দিতে হবে—

(১) মানস যাত্রার লেখক কে —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১)

(২) বদ্ধ ঘরে না থেকে জগৎটাকে দেখতে চেয়েছেন কে —বিবেকানন্দ (২)

(৩) বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩)

(৪) ছেলেবেলা ব্রহ্মদত্যিকে ভয় পেত না— নজরুল ইসলাম (৪)

(B) **রসানুভূতিমূলক প্রশ্ন** (Appreciative question)

আগেই বলেছি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার পরিচয় পেতে হলে রচনাধর্মী (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত) উত্তরই সুবিধাজনক। "হ্যাঁ" "না" মূলক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এক আক্ষরিক উত্তর সমন্বিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে রসানুভূতির পরিচয় গ্রহণ করা বিশেষ দুরূহ। একটা বিষয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে, রসানুভূতিমূলক প্রশ্নে বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি ঠিক ধরা পড়েছে কি না।

যেমন—"প্রজাদের যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি দেশের সর্বত্র বড়ো বড়ো রাস্তা তৈরী করে আশে পাশে বৃক্ষরোপণ ও কূপ খনন করিয়ে দিয়েছিলেন—" প্রিয়দর্শী অশোক

এই লাইনটা থেকে কি রোপন করেছিলেন বা কি খনন করেছিলেন জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে সে সব হবে জ্ঞান মূলক প্রশ্ন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বৃক্ষরোপণ ও কূপ খননের মধ্যে দিয়ে অশোকের কিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে সে হবে অনুভূতি মূলক প্রশ্ন—

এইবার এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করি—

(ক) **সম্ভাব্য উত্তর নির্বাচন** (Mutiple Choice test)—

"যে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আমি রাজা হয়ে তা পারব না" উত্তরে রাজামশাই বলতে চেয়েছেন—

১। (ক) ফকির রাজা থেকেও শক্তিশালী।

(খ) ফকির অনেক মন্ত্র জানে যা রাজা জানেন না।

(গ) সামান্য ফকির হয়ে যদি সে অসুখ বিসুখ এড়িয়ে চলতে পারে, তবে তিনি রাজা হয়ে পারবেন না কেন ?

২। "মন্ত্রী দিল চিতোরের মাঝে নকল কেল্লা পাতি"

(ক) মন্ত্রীর উদ্দেশ্য হল চিতোরের রাণাকে ঠাণ্ডা করা

(খ) চিতোরের রাণার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা

(গ) চিতোরের রাণাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা

৩। কবীর বলতেন—"সাধুলোককে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করার দরকার নেই। সাধু সাধুই —"

কবীরের এই কথার তাৎপর্য হল—

(ক) হিন্দু বা মুসলমান হলে সাধু হওয়া যায় না।

(খ) সাধু ব্যক্তির আলাদা কোন ধর্ম নেই কারণ তাঁরা সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করেন।

(গ) সাধু ব্যক্তিরা হয় হিন্দু না হয় মুসলমান তাই তাদের আর আলাদা কোন চিহ্ন নেই।

(খ) **সত্যমিথ্যা নির্ণয়** (True False test)

নীচে কতকগুলি বাক্য আছে সেগুলির মধ্যে যেগুলি সত্য সেটির পাশে (V) চিহ্ন দাও।

(ক) অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের কিছু পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

(খ) অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের কিছু পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

(গ) কবীর জাত মানতেন।

(ঘ) কবীর ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে বড় করে দেখতেন না।

(ঙ) হরপ্পা আর মহেনজোদড়ো এক সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।

(চ) হরপ্পা আর মহেনজোদড়ো ভারতবর্ষে অবস্থিত।

(ছ) বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মপ্রচারকে বলা হয় ধর্মচক্র প্রবর্তন।

(জ) বুদ্ধদেবের প্রথম ধর্মপ্রচারকে বলা হয় অশোক চক্র প্রবর্তন।

(ঝ) মহাকাশে বাতাস নেই।

(ঞ) মহাকাশে যতই উপরে ওঠা যায় ততই গরম বাড়ে।

(গ) **ঠিক করে সাজান** (Matching test)

কতকগুলি কবিতাংশ এলোমেলোভাবে সাজান হয়েছে সেগুলি ঠিক করে সাজাতে যেখানে যে নম্বর দরকার সেটি বসাও।

(ক) ঝুঁটি বাঁধা ডাকাত সেজে ( ) ··গাছতলা শুয়ে আছে মানুষটাকে (১)

(খ) বনের মধ্যে গাছের ছায়ায় ( )···এক জাহাজের লকরি (২)

(গ) ব্যাঙমা শুধালো ব্যাঙমীকে ( )···দল বেঁধে মেঘ চলছে যে (৩)

(ঘ) সাধ হয়েছে করব আমি ( )···বেঁধে নিতাম ঘর (৪)

(e) **শব্দার্থ ও ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্নাবলী—**

১। নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটি শব্দের ডানদিকে তিনটি অর্থ দেওয়া আছে যেটা প্রকৃত উত্তর সেইটের গায়ে (<) চিহ্ন দাও ।

অপূর্ব — পশ্চিমদিক, অভিনব, পবিত্র

উন্মনা — চিন্তাহীন, অবিবেচনা, উদ্বিগ্ন

কিংবদন্তী — উপন্যাস, অতীত, জনশ্রুতি

জনপদ — মাটি, মানুষ, দেশ

২। নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটির পাশে তিনটি শব্দ দেওয়া আছে। একটি শব্দ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সেইটিতে V এই চিহ্ন দাও

আরোহণ— পলায়ন, উন্নতি, অবনতি, অবরোহন

অনুরাগ — বিরাগ, ভালবাসা, শুভেচ্ছা

সহজ — কোমল, কর্তব্য, কঠিন

অজানা — অজ্ঞাত, অজ্ঞান, জানা

৩। নীচের শব্দগুলি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ বেছে নিয়ে বিশেষ্য হলে (১) ও বিশেষণ হলে (২) চিহ্ন দাও।

গাম্ভীর্য, পরিণাম, অনুবাদ, অপমানিত, উত্তেজিত, তৃপ্ত।

৪। আলো আর অন্ধকার এই দুটি শব্দের মধ্যে যে সম্বন্ধ, নীচের শব্দগুলিতে সেই সম্বন্ধযুক্ত শব্দে দাগ দাও

কঠিন — শক্ত, ভঙ্গুর, কোমল

দিন — সকাল, দুপুর, রাত্রি

গরম — নরম, ঠাণ্ডা, তরল

৫। নীচের শব্দগুলির পরে ঠিক কোন শব্দটি বসলে ভাল হয় তা নির্বাচন করে লেখ।

(১) ধপধপে, টকটকে, ফুটফুটে, ফোঁসফোঁস, শনশন, দাউদাউ, ফিসফিস।

কবিতার পাঠটীকা

তারিখ……
বিদ্যালয়………
শ্রেণী……অষ্টম
ছাত্র সংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৩
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক—শ্রী

বিষয়—বাংলা পদ্য
পাঠপরিচয়—"তুলনা"—
শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর
অদ্যকার পাঠ সম্পূর্ণ কবিতাটি

উদ্দেশ্য : নিরাসক্ত সাধক-কণ্ঠ হইতে স্বতঃউৎসারিত, ভগবৎ-উদ্দেশ্যে নিবেদিত সঙ্গীতের যে মাহাত্ম্য কবিতাটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ধ্বনি ছন্দ ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রসসঞ্চারী পাঠেব মাধ্যমে তাহার রসোপলব্ধি করিয়া ইহার কাব্য-সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য উপভোগ করিতে ছাত্রগণকে সাহায্য করা।

আয়োজন : পাঠ্য কবিতাটির মর্মানুযায়ী পবিত্র ভাব পরিমণ্ডল রচনা করিয়া উহার মূলরসের সহিত ছাত্রগণের সাহচর্য স্থাপনেব উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপভাবে পাঠের অবতারণা করা হইবে—

অসীম আকাশে পরম পুলকে
পাখী গাহে সেই গান
জগত-পিতার স্তবগান সে যে
স্বরগের অবদান।
খাঁচার পাখীটি সদা বুলি বলে
তুষিতে পালক মন,
সে—তোষণ ভাষণে মিলিবে কেমন
পরাণের পরশন ?

কবিতাটি বলিয়া নিম্নরূপ প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের সূচনা করা হইবে :—

(১) আকাশে উড়িয়া উড়িয়া পাখী গান গাহে কেন ?
(২) খাঁচার পাখী বুলি বলে কেন ?
(৩) খাঁচার পাখীর বুলিতে প্রাণের স্পর্শ নাই কেন ?
(৪) মুক্তপাখীর গান খাঁচার পাখীর বুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ?

পাঠঘোষণা : সাধক হরিদাস যে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভগবৎ চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন, সে সঙ্গীতের মনোহারিতা ও মাহাত্ম্য অপার সঙ্গীত বিশারদ দিল্লীপতি আকবরের সভাগায়ক তানসেনের সঙ্গীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আজ আমরা কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'তুলনা' নামক কবিতা হইতে উপলব্ধি করিব।

উপস্থাপনা : (ক) প্রথমতঃ মূলভাব ও রসের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাযথ ধ্বনি ও ছন্দোবিন্যাসে শিক্ষক কবিতাটির একটি আদর্শ পাঠ দিবেন। এবং ছাত্রেরা ইহার মর্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন :—

(১) সাধক হরিদাস কোথায় কি ভাবে গান গাহিয়া ফিরিতেন ?

(২) তাঁহার গান শুনিয়া সম্রাট তানসেনকে কি বলিলেন ?

(৩) তানসেন তাহার উত্তরে সম্রাটকে কি বলিলেন ?

(খ) এইবার শিক্ষক সমগ্র পাঠটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পাঠ করিবেন এবং নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের সহযোগিতায় পঠিত অংশের মূলভাব, সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য এবং দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের আলোচনা করিবেন :—

প্রথম অংশ (কবিতাটির প্রথম ছয় পংক্তি) পাঠ ও প্রশ্ন :—

(১) হরিদাসের গান কাহারা শুনিত ?

(২) তিনি কোথায় কি সাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ?

(৩) এখানে 'দর্শন' পদটির পদ্যে কি রূপ দেওয়া হইয়াছে ?

(৪) সাধক হরিদাস একতারা বাজাইয়া গিরিবনে গাহিয়া ফেরে—এই বাক্যটি পদ্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

(৫) দ্বিতীয় চরণে কোন্ কোন্ ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হইতেছে ?

(৬) কোন ধ্বনি বারবার আবৃত্ত হইয়াছে, এমন কোন কবিতাংশ বল।

তুলনীয় : ["চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ, কোথা চম্পক আভরণ।"]

["গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।"
রবীন্দ্রনাথ]

(৭) কবিতায় একই ধ্বনি বারবার করা হয় কেন ?

[প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক বলিয়া দিবেন—কাব্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। এক ধ্বনি বারবার যোজিত হওয়াকে "অনুপ্রাস" অলঙ্কার বলে]

(৮) নিম্নলিখিত অর্থ বুঝাইতে এখানে কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ?

নদী ; বৃক্ষ ; লোকালয় ।

দ্বিতীয় অংশের (কবিতাটির শেষ আট পংক্তি) পাঠ ও প্রশ্ন :—

(১) সম্রাট কি বেশে তানসেনের সাথে চলিলেন ?

(২) হরিদাসের গানকে "গোমুখী উৎসের মন্দাকিনী" বুঝাইলে, "রুদ্ধবারি কূপ" বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে ?

(৩) তানসেন নিজের গানকে "রুদ্ধবারি কূপ" বলিতেছেন কেন ?

(৪) তানসেন কাহার আদেশে গান করিতেন ?

(৫) হরিদাস কাহার সভায় গান করেন—বলিয়া তানসেন উল্লেখ করিয়াছেন ?

(৬) এখানে "তুলনা" পদটির পদ্যরূপ কি দেওয়া হইয়াছে ?

(৭) "তুলা" শব্দের এইরূপ ব্যবহার দেখাও ।

[তুলনীয় : ("কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা ।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥)]

(৮) নিম্নরূপ অর্থ বুঝাইতে কবি এখানে যে যে পদ ব্যবহার করিয়াছেন সেগুলি বল :—

বাহ্যজ্ঞানশূন্য, স্বর্গের গঙ্গা, হিমালয়স্থ গঙ্গার উৎপত্তি স্থল ।

(গ) এইবার শিক্ষক কবিতাটির অংশ বিশেষ কয়েকটি ছাত্রকে ধ্বনি ও ছন্দসহযোগে পড়িতে বলিবেন এবং নিম্নরূপ ছন্দোবিন্যাসে শুদ্ধভাবে পড়িতে তাহাদের সাহায্য করিবেন—

সাধক হরিদাস । বাজায়ে একতারা । গাইয়া ফেরে গিরি । বনে । বনের পশুপাখী । তটিনী-তটশাখী । তাহার সঙ্গীত । শোনে ।

এখানে প্রত্যেকটি চরণে ৩টি পূর্ণ পর্ব ও ১টি খণ্ড পর্ব পৌনঃপুনিকভাবে আবৃত হইতেছে ; পর্বগুলি ৭ মাত্রার এবং প্রত্যেক ৪ পর্বযুক্ত দীর্ঘ চরণের শেষে পূর্ণ যতি আছে ।

অভিযোজন : (কাব্যপাঠের সার্থকতা বিচার) ছাত্রেরা কবিতাটির মর্ম ও রস সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করা হইবে :—

(১) হরিদাস 'রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে' আসিতেন না কেন ?

(২) হরিদাসের গান শুনিবার জন্য নৃপ ছদ্মবেশ ধরিলেন কেন ?

(৩) তানসেনের গানে "রাগিণী-তাল-লয়" থাকা সত্ত্বেও তাহা সম্রাটের প্রাণ আকুল করিল না কেন ?

(৪) গুরুর গানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্ত তানসেন উহাকে কিসের সহিত উপমা দিয়াছেন ?

(৫) তানসেন কি কারণে বলিয়াছিলেন যে, গুরুর গানের সহিত তাঁহার নিজের গানের তুলনা সাজে না ?

(৬) ভারত-ভূপ আমি তোমার আদেশ মত এ লোক সভা মাঝে গাই—বাক্যটির পদ্যরূপ কি হইবে ?

(৭) কবিতাটির মর্মার্থটি সহজ ভাষায় বল।

বাড়ীর কাজ : "বিশ্ব-ভূপালের সভায় গান তিনি,—"—এই কথাটির তাৎপর্য নিজের ভাষায় বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে।

গদ্যের পাঠটীকা—১

তারিখ—	বিষয়—বাংলা গদ্য
বিদ্যালয়—	পাঠ পরিচয়—'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রেণী—অষ্টম	পাঠক্রম—* (১) আজি কালি ··· জয়ধ্বনি কর।
ছাত্রসংখ্যা—	
গড়বয়স—	
সময়—৪০ মিনিট	(২) এই মঙ্গল···মঙ্গল নাই।
শিক্ষক—শ্রী	অদ্যকার পাঠ তারকা চিহ্নিত অংশ

উদ্দেশ্য :—প্রত্যক্ষ—যথাযথ বিরাম ও শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে উত্তম পঠন, কঠিন শব্দের অর্থ গ্রহণ ও পাঠ্য বিষয়টিকে যথাযথ বুঝিতে সাহায্য করা।

পরোক্ষ—বিষয়টির বর্ণনাভঙ্গীর উপলব্ধি, বিষয়বস্তুর সম্যক জ্ঞানলাভ ও চিন্তাশক্তির বিকাশ।

আয়োজন :—ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাপূর্বক বর্তমান পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হইবে—

(১) 'উন্নতি' বলিতে কি বুঝ ?

(২). 'জাতির সামগ্রিক উন্নতি সাধন' এই কথা বলিলে কি বুঝা যায় ?

(৩) দৈহিক বা দেহের কোন একটি অংশের উন্নতি হইলে কি দেহের সামগ্রিক উন্নতি হইয়াছে বলা যায় ?

(৪) দেশের লোকসংখ্যাকে আর্থিক দিক দিয়া কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ?

(৫) ধনিকের উন্নতিতে দেশের সামগ্রিক উন্নতি হয় না কেন ?

(৬) 'দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের উন্নতিই' দেশের উন্নতি এই কথার তাৎপর্য কি ?

পাঠঘোষণা : আমরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ —'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'র প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ আলোচনা করিব এবং দেশের তৎকালীন কতটা উন্নতি হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিব।

উপস্থাপন :—প্রথমতঃ মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাযথ উচ্চারণ সহযোগে শিক্ষক আলোচ্যমান প্রবন্ধটির অন্তকার পাঠ পর্যন্ত একটি মনোজ্ঞ পাঠ দিবেন। ছাত্রেরা ইহার ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা জানিবার জন্য শিক্ষক নিম্নানুসারে প্রশ্ন করিবেন—

(১) মুষ্টিমেয় ধনিকের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধি নয় কেন ?

(২) দেশের জনসাধারণ বলিতে কাহাদের বুঝায় ?

(৩) ইংরেজ শাসনে আমরা কিরূপ সভ্য হইয়াছি ?

(৪) দেশের কি মঙ্গল হইতেছে ?

এইবার শিক্ষক পাঠটিকে দুই অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ পাঠ করিবেন এবং নিম্নানুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের আলোচনা করিবেন।

১ম অংশ (১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ) পাঠ ও প্রশ্ন

আলোচ্য অংশে কোন্ সময়কার উন্নতির কথা লেখক বলিয়াছেন ?

(২) 'ইংরেজ শাসন কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি'—এখানে কৌশলটি কি ?

(৩) 'লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ' বলিতে কি বুঝ ?

(৪) এই লৌহতুরঙ্গকে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের সহিত তুলনা করিয়াছেন কেন ?

(৫) লৌহতুরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া কিসের সুবিধা হইয়াছে ?

(৬) বিদ্যুৎ কাশীধামের সংবাদ কি ভাবে দিল ?

(৭) দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার কি সুবিধা হইয়াছে ?

(৮) 'পৃথিবী নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে' এই কথার তাৎপর্য কি ?

দ্বিতীয় অংশ (তৃতীয় অনুচ্ছেদ) পাঠ ও প্রশ্ন

(১) পূর্বে বৃহস্পতি গ্রহকে কিরূপে শ্রদ্ধা করা হইত ?

(২) সভ্যযুগে বৃহস্পতিকে বৈজ্ঞানিকরা কি বলিয়া মনে করেন ?

(৩) কাগজের পূর্বেকার রূপ কি ছিল ?

(৪) তখনকার লোকের চিন্তাধারার সহিত বর্তমান যুগের লোকের চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায় ?

(৫) লেখক দেশের এত উন্নতি সত্ত্বেও খুশি নন কেন ?

(৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

দিগ্‌গজ, অগ্নিময়ী, তরণী, ক্রীড়াশীল হংস, কাশীধাম, নবীন চিকিৎসা, ভাগীরথী।

এইবার শিক্ষক মহাশয় পাঠ্যাংশটি কয়েকটি ছাত্রকে পড়িতে বলিবেন এবং ভুল সংশোধনে সাহায্য করিবেন।

অভিয়োজন :—ছাত্রগণ অদ্যকার পাঠ্যবিষয়টির মর্ম সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে পারিয়াছে কি না জানিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিবেন।

(১) কোন্ দিক হইতে দেশের উন্নতি হইয়াছে ?

(২) গাড়ী-ঘোড়া, রাস্তাঘাট, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতি দেশের যথার্থ উন্নতি নয় কেন ?

(৩) ইংরাজ আমলে দেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও লেখক খুশি নন কেন ?

(৪) দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য লেখক জয়ধ্বনি করিতে সম্মত নন্ কেন ?

(৫) লেখক কোন উন্নতির কথা চিন্তা করেন এবং তৃপ্ত হন ?

গৃহকাজ :—তৎকালীন যুগে দেশের কোন্ কোন্ দিকের উন্নতি হইয়াছিল—অদ্যকার পাঠ অবলম্বন করিয়া বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

গদ্যের-পাঠটীকা—(২)

তারিখ—	**বিষয়**—বাংলা সাহিত্য
বিদ্যালয়—	**বিশেষ পাঠ**—'দুষ্মন্ত ও ভরত' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
শ্রেণী—অষ্টম	
ছাত্রসংখ্যা—	**পাঠক্রম**—
গড়বয়স—	(ক) রাজা দানব জয় কার্যে···বর্তিয়াছে।
সময়—৪০ মিনিট	*(খ) এইরূপ···আবির্ভাব হইতেছে।
শিক্ষক—	(গ) এদিকে...বলা যায় না।
	*চিহ্নিত অংশ অদ্যকার পাঠ।

উদ্দেশ্য :—লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত 'শকুন্তলা' নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে সংকলিত 'দুষ্মন্ত ও ভরত' নামক আখ্যায়িকা পাঠে ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমে নিজ পুত্র ভরতকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত হৃদয়ে যে অনুপম পুত্রস্নেহসুখ অনুভব করিতেছেন তাহার রসাস্বাদনে ছাত্রদের সহায়তা করা।

আয়োজন :—ছাত্রদের মন পাঠ্যাভিমুখী করিবার জন্য এবং পবিত্রভাব পরিমণ্ডল রচনা করিবার জন্য তাহাদের পূর্বজ্ঞানের পটভূমিকায় শিক্ষক-মহাশয় নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

১। রাজা দুষ্মন্ত ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমকে স্বর্গাপেক্ষা অধিকতর শান্তিময় স্থান বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন কেন ?

২। পিতার নিকট সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র কে ?

৩। শকুন্তলা কাহার পত্নী ছিলেন ?

৪। দুষ্মন্ত কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ?

৫। ভারতবর্ষ কাহার নামানুসারে হইয়াছে ?

লেখক পরিচিতি :—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ, মৃত্যু—১৮৯১ খ্রীঃ) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি নয় বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং একুশ বৎসর বয়সে উক্ত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।

তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত, দয়ালু এবং পরোপকারী মহাশয় বিরল। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি 'সীতার বনবাস', 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'উত্তর রামচরিত', প্রভৃতি প্রায় পঁচিশ খানা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

পাঠ ঘোষণা :—অদ্য আমরা 'দুষ্মন্ত ও ভরত' নামক আখ্যায়িকা পাঠে রাজা দুষ্মন্তের ভগবান্ কশ্যপের আশ্রমে আগমনে যে পরিবেশ ও ভাবরসের, এবং স্বীয় পুত্র দর্শনে পিতৃমনে যে স্নেহ ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিব।

উপস্থাপন :- প্রথমতঃ মূলভাব ও রসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যথাযথ উচ্চারণে শিক্ষক আলোচ্যমান আখ্যায়িকার অন্তকার পাঠ পর্যন্ত একটি মনোজ্ঞ পাঠ দিবেন। ছাত্রেরা ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

১। হেমকূট পর্বতে কে তপস্যা করিতেন ?

২। 'দেবরাজ সারথে!' কাহাকে বলা হইতেছে ?

৩। রাজা কাহাকে বর্জন করিয়াছিলেন ?

৪। শিশুকে দেখিয়া রাজার মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ?

এইবার শিক্ষক পাঠটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের পাঠ দিবেন এবং নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

প্রথম অংশের (প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) পাঠ ও প্রশ্ন :

১। রাজা কাহার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছিলেন ?

২। তিনি ঋষিদর্শন হইতে বিরত হইলেন কেন ?

৩। মহর্ষি কশ্যপকে 'ভগবান্' বলা হইতেছে কেন ?

(ষড়্গুণ-ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য।)

৪। 'পতিব্রতা ধর্ম' কি ?

৫। প্রাচীনকালে আশ্রমে 'পবিত্রতা ধর্ম' শিক্ষা দেওয়া হইত কেন ?

দ্বিতীয় অংশের (তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ) পাঠ ও প্রশ্ন :

১। 'রাজার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল।'- এইরূপ স্পন্দন কিরূপ লক্ষণ সূচিত করিতেছে ?

২। 'মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন'—রাজার আক্ষেপের কারণ কি ?

৩। 'এ অবিনয়ের স্থান নহে'—আশ্রম অবিনয়ের স্থান নহে কেন ?

৪। ঈশ্বরাধনায় কোন্ কোন্ অনিষ্টকারী রিপু দমনের প্রয়োজন ?

৫। 'বৎস! এত দুর্বৃত্ত হও কেন?'—'বৎস' কাহাকে বলা হইতেছে?

৬। 'দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন'—কোন্ দৃশ্য দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত চমৎকৃত হইলেন?

৭। রাজা তপোবনের কোন্ 'অনির্বচনীয় মহিমা' উপলব্ধি করিলেন?

৮। 'এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? শিশুকে দেখিয়া রাজার হৃদয়ে কোন্ রসের সঞ্চার হইল?

ছাত্রদের পাঠ:—এইবার শিক্ষক মহাশয় অদ্যকার পাঠটিকে কয়েকজন ছাত্রকে পড়িতে বলিবেন এবং উচ্চারণ ভুল হইলে ছাত্রদের সহায়তায় তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

অভিযোজন:—অদ্যকার পাঠের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

১। মহর্ষি কশ্যপকে ভগবান্ বলা হইতেছে কেন?

২। আধুনিক বাংলার কোন্ মহাপুরুষকে 'ভগবান্' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?
(ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ)

৩। 'আধুনিক যুগে পতিব্রতা ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন'—কেন?

৪। রাজার দক্ষিণবাহুর স্পন্দন কোন্ শুভ লক্ষণ সূচিত করিতেছে?

৫। 'এ অবিনয়ের স্থান নহে'—এই কথার তাৎপর্য কি?

৬। শিশুকে দেখিয়া রাজার হৃদয়ে কোন্ রসের সঞ্চার হইল?

৭। রাজার আক্ষেপের কারণ কি?

গৃহকার্য: অদ্যকার পাঠ্যাংশে শিশুকে দেখিয়া রাজার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ছাত্রদিগকে বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

ব্যাকরণ-পাঠটীকা—(১)

তারিখ--
বিদ্যালয়—
শ্রেণী - ষষ্ঠ
গড়বয়স—১১ বৎসর
ছাত্র সংখ্যা—৩০
সময়—৪০ মিনিট
শিক্ষক—শ্রী

বিষয় —বাংলা ব্যাকরণ
পাঠক্রম —বর্ণ প্রকরণ :--
(ক) বর্ণ ও ধ্বনি
(খ) সন্ধি প্রকরণ
(i) স্বর সন্ধি (প্রথম চারিটি সূত্র)
(ii) স্বর সন্ধি—(অবশিষ্ট সূত্র)
(গ) ব্যঞ্জন সন্ধি
(ঘ) (i) অন্তকার পাঠ

উদ্দেশ্য—মুখ্য :—বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ও তাহার সূত্রাবলীর যথাযোগ্য প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করা--

গৌণ : -ছাত্রদিগের চিন্তা যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশে সাহায্য করা—

আয়োজন : -ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাপূর্বক বর্তমান পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(ক) বাংলা বর্ণমালায় কয়টি বর্ণ, বর্ণগুলি কয় ভাগে বিভক্ত ?

(খ) 'বিদ্যালয়' শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে কি কি বর্ণ পাওয়া যায় ?

(গ) ইহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ কোনগুলি ও ব্যঞ্জনবর্ণ কোনগুলি ?

(ঘ) সন্নিহিত পদ দুইটির অন্তর্গত কোন কোন বর্ণ এখানে মিলিত হইয়াছে ?

পাঠঘোষণা : - এইভাবে দুইটি স্বতন্ত্রপদের অন্তর্গত সন্নিহিত বর্ণদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। মিলিত বর্ণদ্বয় স্বরবর্ণ হইলে স্বরসন্ধি ও ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে হয় ব্যঞ্জনসন্ধি।

"আজ আমরা স্বরসন্ধির প্রথম চারিটি নিয়ম ও প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাদের সূত্র নির্মাণের জ্ঞান অর্জন করিব -"

—এই বলিয়া শিক্ষক অন্তকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন :—পাঠ্যাংশটি নিম্নরূপ চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষক অন্তকার পাঠ পরিচালনা করিবেন—

(i) শিক্ষক প্রথমে নিম্নলিখিত পদগুলি বোর্ডে লিখিয়া অন্তকার আলোচনা সুরু করিবেন।

নরাধম, কুশাসন, মহাবণ্য, জলাশয়, বিদ্যালয়—উল্লিখিত পদগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া স্বরসন্ধির সাধারণ সূত্রটি আবিষ্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে—

(১) এই পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে কি কি শব্দ পাওয়া যায় ?

(২) ওই সব শব্দযুগলের মধ্যে কোন্ কোন্ বর্ণের মিলন ঘটিয়াছে ?

(৩) এই মিলনের ফলে কোন্ কোন্ বর্ণের কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে ?

পাঠ পরিচালনার সঙ্গে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

নর (অ)+(অ) ধম=নর (আ) ধম নরাধম
কুশ (অ)+(আ) সন=কুশ (আ) সন= কুশাসন
মহ (অ)+(অ) রণ্য=মহ (আ) রণ্য=মহারণ্য
জল (অ)+(আ) শয়=জল (আ) শয়=জলাশয়
বিদ্য (আ)+(আ) লয়=বিদ্য (আ) লয়=বিদ্যালয়

(৪) অ-কার বা আ-কারের পরে অ-কার বা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে ?

(অ) অতঃপর সূত্র নিষ্কাষণ করিয়া শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দিবেন -

- অ-কার কিম্বা আ-কারের পর অ-কার কিম্বা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ কার হয়। ঐ আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(ii) ১ম ভাগে বর্ণিত অনুরূপ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রদের সহায়তায় সূত্র নিষ্কাষণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে--

যত (ই)+(ঈ) ন্দ্র=যত (ঈ) ন্দ্র=যতীন্দ্র
মন (ই)+(ঈ) শ=মন (ঈ) শ=মনীশ
পর (ই)+(ঈ) ক্ষা=পর (ঈ)=পরীক্ষা
যোগ (ঈ)+(ঈ) শ্বর=যোগ (ঈ) শ্বর=যোগীশ্বর

(খ) ই-কার বা ঈ কারের পর ই-কার বা ঈ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয়। ঐ ঈ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

(iii) কট (উ)+(উ) ক্তি=কট (উ) ক্তি=কটূক্তি
লঘ (উ)+(ঊ) র্মি=লঘ (ঊ) র্মি=লঘূর্মি

(গ) উ-কার বা ঊ-কারের পরে উ কার বা ঊ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয়। ঊ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

(iv) যথ (আ)+(ই) ষ্ট=যথ (এ) ষ্ট=যথেষ্ট

পর (অ)+(ঈ) শ=পর (এ) শ=পরেশ

মহ (আ)+(ঈ) শ=মহ (এ) শ=মহেশ

(ঘ) অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয়। ঐ এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

বোর্ডের কাজ—পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সহযোগিতায় শব্দ বিশ্লেষণ-পূর্বক সন্ধির সূত্র রচনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।

অভিযোজন—ছাত্রেরা অদ্যকার পাঠ কি পরিমাণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ও সন্ধি সম্বন্ধীয় সূত্র প্রয়োগের অনুশীলন করাইবার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নাবলী অবতারণা করা হইবে—

(১) নবীন ধান্যে হবে নবান্ন

(২) হিমালয়ের শোভা অপূর্ব

(৩) মন দিয়া বিদ্যার্জন করিবে

(৪) মহেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন

(৫) রমেশকে ডাকিয়া দাও

(৬) কাহাকেও কটূক্তি করিও না

(৭) বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন

এই বাক্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ শব্দ সন্ধিযুক্ত হইয়াছে?

কোন্ কোন্ শব্দযুগলের সন্ধি হইয়াছে?

নিম্নের বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে সন্ধিবদ্ধ কর—

গ্রন্থ+আগার, চরণ+অমৃত, মহা+অর্ঘ্য, পরম+ঈশ্বর, মহা+ইন্দ্র,

কোন কোন সূত্র অনুসারে শব্দগুলি সন্ধিযুক্ত হইয়াছে?

বাড়ীর কাজ—তোমাদের সাহিত্য পুস্তকের যে কোন একটি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া তাহার প্রথম অনুচ্ছেদে কোন কোন শব্দগুলি স্বরসন্ধিযুক্ত হইয়াছে তাহা বাছিয়া বাহির কর এবং তাহাদের সূত্রগুলি লিখ।

ব্যাকরণ-পাঠটীকা (২)

বিদ্যালয়—	**বিষয়**—বাংলা ব্যাকরণ
শ্রেণী—সপ্তম	**পাঠক্রম**—
ছাত্রী সংখ্যা—	"কারক"
বয়সের গড়—	কারকের শ্রেণীবিভাগ—
সময়—	কারক বিভক্তি নির্ণয়
তারিখ—	অদ্যকার পাঠ
শিক্ষিকা—শ্রীমতী	কারক ও তাহার একটি শ্রেণী

উদ্দেশ্য—মুখ্য :—বাংলা ব্যাকরণের কারক সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ও তাহার সূত্রাবলীর যথাযোগ্য প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা—

গৌণ :—শিক্ষার্থীদিগের চিন্তা যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশে সহায়তা করা—

আয়োজন—শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাপূর্বক বর্তমান পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(ক) পদ কয় প্রকার ও কি কি ?

(খ) ক্রিয়া কাহাকে বলে ?

(গ) "ইন্দিরা বই পড়িতেছে"—কোন্‌টি কি পদ ?

(ঘ) এই "পড়িতেছে" ক্রিয়ার সহিত 'ইন্দিরা' এবং 'বই' পদের সম্বন্ধ কি ?

পাঠঘোষণা—এইভাবে "ক্রিয়ার সহিত বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের যে সম্বন্ধ তাহার নাম কারক।"

—"আজ আমরা কারকের প্রথম একটি শ্রেণীর নিয়ম ও প্রণালী আলোচনা করিয়া ইহাদের সূত্র নির্মাণের জ্ঞান অর্জন করিব—"

এই বলিয়া শিক্ষিকা অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন—পাঠ্যাংশটি নিম্নারূপ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষিকা অদ্যকার পাঠ পরিচালনা করিবেন—

(ক) কোনও কার্য যাহার ইচ্ছায় হয়, বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া হয় তাহাকে এক কথায় কি বলা যায় ? [কর্তা]

(শিক্ষিকা ছাত্রীগণের সাহায্যে কর্তৃকারক নির্ণয় করিয়া চিহ্নিত করিবেন)

২। কর্তা যাহা করে তাহা—? (কর্ম চিহ্নিত হইবে)

৩। ক্রিয়াসম্পাদনের উপায়টি—(করণ চিহ্নিত হইবে)

৪। যে স্থান অথবা সময় অধিকার করিয়া ক্রিয়া ঘটে তাহা—

(অধিকরণ চিহ্নিত হইবে)

৫। যাহাকে কিছু দান করা হয়, সে—(সম্প্রদান চিহ্নিত হইবে)

৬। যাহা হইতে কিছু জন্মে বা আসে তাহা—(অপাদান চিহ্নিত হইবে) পরে শিক্ষিকা নিম্নলিখিত বাক্যটির ক্রিয়া কারক সম্পর্ক ছাত্রীগণের সহায়তায় আলোচনা করিবেন :—

(খ) (i) এইবার শিক্ষিকা নিম্নলিখিত বাক্যটি বোর্ডে লিখিয়া আলোচনা করিবেন —"রাজা স্বহস্তে অর্থভাণ্ডার হইতে দরিদ্রদিগকে সভাকক্ষে অর্থদান করিতেছেন।" উল্লিখিত বাক্যটি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্যপদের যে সম্বন্ধ তাহা আবিষ্কারের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে এবং তাহা বিশ্লেষণ সহ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন—

(১) কে দান করিতেছেন ? রাজা (কর্তৃ সম্বন্ধ)

(২) কি দান করিতেছেন ? অর্থ (কর্ম সম্বন্ধ)

(৩) কিসের দ্বারা দান করিতেছেন ?—স্বহস্তে (করণ সম্বন্ধ)

(৪) কাহাদিগকে দান করিতেছেন ?—দরিদ্রদিগকে (সম্প্রদান সম্বন্ধ)

(৫) কোথা হইতে দান করিতেছেন ?—অর্থ ভাণ্ডার হইতে (অপাদান সম্বন্ধ)

(৬) কোথায় দান করিতেছেন ? –সভাকক্ষে (অধিকরণ সম্বন্ধ)

(৭) তাহা হইলে কারক কয় প্রকার হইল ?

উপস্থাপন (ক)—অতঃপর সূত্র নিষ্কাষণ করিয়া শিক্ষিকা বোর্ডে লিখিয়া দিবেন— "ক্রিয়ার সহিত অন্যপদের যে সম্বন্ধ তাহাকে কারক বলে।"

(ii) প্রথম ভাগে বর্ণিত অনুরূপ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সূত্র নিষ্কাষণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে—

(১) 'বুলবুলিতে' ধান 'খেয়েছে'—এখানে ক্রিয়াপদ 'খেয়েছে' কাহাকে আশ্রয় করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে ?

(২) পাখি উড়িতেছে এখানে 'উড়িতেছে' কার্যটি কাহাকে আশ্রয় করিয়া সম্পাদিত হইতেছে ?

সূত্রগঠন (খ) "ক্রিয়ার যে আশ্রয় সে কর্তা, অর্থাৎ যাহার প্রযত্নে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, অথবা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে-ই কর্তা।"

(গ) ইহাকে কি কারক বলা যায় ?

[এইভাবে যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে বিভিন্ন কারক আলোচনা করা যাইতে পারে।]

বোর্ডের কাজ—পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বাক্য বিশ্লেষণ পূর্বক কারকের সূত্র রচনা করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া হইবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীগণ অদ্যকার পাঠ কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হইবে—

(১) কারক কাহাকে বলে ?

(২) কারক কয় প্রকার ও কি কি ?

(৩) নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে কর্তৃকারক বাহির কর—

(i) দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

(ii) গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

বাড়ীর কাজ—তোমাদের সাহিত্য পুস্তকের যে কোন একটি প্রবন্ধ নির্বাচন করিয়া তাহার প্রথম অনুচ্ছেদে কোন্ কোন্ বাক্যাংশগুলি কর্তৃকারক যুক্ত হইয়াছে তাহা বাছিয়া বাহির করিবে এবং তাহাদের খাতায় লিখিয়া আনিবে।

ব্যাকরণ-পাঠটীকা—(৩)

তারিখ	**বিষয়**—বাংলা ব্যাকরণ।
বিদ্যালয়—	**পাঠপরিচয়**—সমাস।
শ্রেণী—নবম	**পাঠক্রম**—(১) দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু,
ছাত্রসংখ্যা—	*(২) তৎপুরুষ,
গড় বয়স ১৪	(৩) বহুব্রীহি,
সময়—৪০ মিনিট।	(৪) কর্মধারয়,
শিক্ষক—শ্রী	(৫) অব্যয়ীভাব,
	*অদ্যকার পাঠ।

উদ্দেশ্য :—মুখ্য—বাংলা ব্যাকরণের সমাস ও তাহার নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের সহায়তা করা—

গৌণ—ছাত্রদিগের চিন্তা-যুক্তি-বিচার ও বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

আয়োজন :—ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষাপূর্বক বর্তমান পাঠের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্তে নিম্নামুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(১) 'হিতাহিত'—শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে কি কি পদ পাওয়া যাইবে?

(২) 'হিত' ও 'অহিত' পদদ্বয়ের মিলনে কোন সমাসের উদ্ভব হইয়াছে?

(৩) দ্বন্দ্ব সমাস কাহাকে বলে?

(৪) দ্বন্দ্ব সমাসের দুইটি উদাহরণ দাও।

(৫) পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হইয়া যে সমাস হয় তাহাকে কোন্ সমাস বলে?

পাঠ ঘোষণা :—আজ আমরা তৎপুরুষ সমাসের সমাসবদ্ধ পদ বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষিত পদ সমাসবদ্ধ করিয়া তৎবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করিব।

উপস্থাপন :—শিক্ষকমহাশয় প্রথমে নিম্নামুরূপ বাক্যগুলি বোর্ডে লিখিবেন, উহার পর কতকগুলি পদ রেখাঙ্কিত করিয়া অত্যকার আলোচনা আরম্ভ করিবেন—

(১) "এই **শরণাগত** ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না।"

(২) "মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে **বিদ্যাভ্যাস** করিতেছি।"

(৩) "সুলতা **ফুলতোলা** রুমালটা আমার হাতে দিল।"

(৪) "নির্বাণহীন **আলোকদীপ্ত** তোমার ইচ্ছাখানি"

(৫) "অধ্যাপকরা সকলেই একটু বিশেষ **শোকাভিভূত** হলেন।"

(৬) "পথের দুঃখ দিলেম তোমায় এমন **ভাগ্যহত**।"

(৭) ইচ্ছা ছিল **বরণমালা** পরাই তোমার গলে।"

(৮) "সহসা **মড়াকান্না** শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম।"

(৯) "কাহাকে বা **ধর্মভয়** দেখাই।"

(১০) "যেন **দুরাগত** কোন অন্তরের বাণী কি কহে হিয়ায়।"

(১১) "উঠানপ্রান্তে এক **ডালিমগাছ** ছিল।"

(১২) "**রাজপুরীতে** বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান।"

(১৩) "**জ্ঞানবৃদ্ধ** লোকটি বলিলেন—উপায় আছে।"

(১৪) "**ধূলিপতিত** দুর্বল চিত করহ জাগরূক।"

(১৫) মঙ্গল করো **নিরলস** নিঃসংশয় করো হে।"

(১৬) "শেষ অবধি **ভাগের-মা** গঙ্গা পেলে হয়।"

উল্লিখিত পদগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীকরণ নির্ণয়ের জন্ম নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে—

উপস্থাপন :—(১) এই পদগুলি বিশ্লেষণ করিলে কি কি পদ পাওয়া যাইবে?

(২) পদগুলির মধ্যে কোন পদের প্রাধান্য আছে ?

(৩) কোন বিভক্তি লুপ্ত হইয়া সমাসবদ্ধ পদ গঠিত হইয়াছে ?

পাঠ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকমশায় ছাত্রদের সহায়তায় পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বোর্ডে লিখিয়া দিবেন—

শরণাগত=শরণকে আগত অর্থাৎ প্রাপ্ত।

বিদ্যাভ্যাস=বিদ্যাকে অভ্যাস। ফুলতোলা=ফুলকে তোলা।

আলোক দীপ্ত=আলোক দ্বারা দীপ্ত।

শোকাভিভূত=শোক দ্বারা অভিভূত। ভাগ্যহত=ভাগ্য দ্বারা হত।

বরণমালা=বরণের জন্য মালা। মড়াকান্না=মড়ার জন্য কান্না।

ধর্মভয়=ধর্ম হইতে ভয়। দূরাগত=দূর হইতে আগত।

ডালিমগাছ=ডালিমের গাছ। রাজপুরীতে=রাজার পুরীতে।

জ্ঞানবৃদ্ধ=জ্ঞানে বৃদ্ধ। ধূলিপতিত=ধূলিতে পতিত।

নিরলস=ন অলস। ভাগের-মা=ভাগের মা।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি বিচার করিয়া শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের সহযোগিতায় তৎপুরুষ সমাসের শ্রেণীকরণ করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বোর্ডে লিখিয়া দিবেন।

অভিযোজন ঃ—নূতন অবস্থায় অধীত জ্ঞান ছাত্রেরা প্রয়োগ করিতে পারে কিনা অথবা কতখানি পারে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নানুরূপ বিচ্ছিন্ন পদগুলিকে সমাসবদ্ধ করিতে বলা হইবে—

লোককে দেখানো রক্তের নিমিত্ত মঞ্চ,

ছায়া দ্বারা শীতল, রোগ হইতে মুক্ত,

অকালে মৃত্যু, ন মিল,

যুধি অর্থাৎ যুদ্ধে স্থির।

উপরোক্ত পদগুলির কোনটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত ?

বাড়ীর কাজ :—পাঠ্যপুস্তকের যে কোন অনুচ্ছেদ হইতে প্রয়োজনানুযায়ী পদগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া উহাদের সমাস নির্ণয় করিয়া দেখাও।

দ্রুতপঠন কাহিনীর পাঠটীকা

তারিখ -	বিষয় বাংলা দ্রুতপঠন
বিদ্যালয়—	বিশেষ সময়—"ছুটি" গল্প (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
শ্রেণী—৯ম শ্রেণী	
গড় বয়স ১৪ বৎসর	
ছাত্রসংখ্যা - ৩০	
সময়- ৪০ মিনিট	
শিক্ষক—শ্রী	

উদ্দেশ্য—(ক) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "ছুটি" গল্পের রসাস্বাদনে ছাত্রদের সহায়তা করা—

(খ) ছুটি গল্পের সহায়তায় ছাত্রদের সাহিত্য-প্রীতির উন্মেষ সাধন ও ছোট গল্পের সাহিত্য মূল্যবোধে সহায়তা করা।

আয়োজন—তরুণ শিক্ষার্থীর মন অন্তকার পাঠ্যাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষানুকূল প্রশ্নগুচ্ছ করিবেন—

(১) কোন কোন ছোট গল্প তোমরা পড়িয়াছ ?

(২) রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত ছোট গল্পের বই এর নাম কর।

(৩) তোমরা যাহারা দূরের গ্রাম হইতে পড়িতে আস, তাহারা স্কুলের দীর্ঘ ছুটির বা অবকাশের সময় কোথায় যাইতে চাও ?

(৪) কোন একটি ছোট ছেলে যদি তাহার ঘর বাড়ী পিতামাতা ছাড়িয়া বিদেশে পড়াশুনার জন্য পড়িয়া থাকে তবে ছুটি পাইলে সে কোথায় যাইতে চাহিবে ?

(৫) আজ আমাদের ছুটিরে ভাই

আজ আমাদের ছুটি।
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন মাঠে যে ঘুরে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি॥

কবিতাংশটিতে শিশুমনের কোন ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে ?

পাঠঘোষণা—ছুটির প্রতি শিশুর আগ্রহ স্বাভাবিক। স্কুলের বন্দীদশা থেকে শিশু চায় মুক্তি—সে যেতে চায় নিজের বাড়ীতে, যেখানে আছে তার স্নেহময়ী জননী স্নেহময় পিতা—অন্যান্য পরিবার পরিজন। কিন্তু যদি কোন কারণে শিশুর এই মিলনের পথটি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, ছুটির পরেও যদি তাকে পিতামাতার স্নেহময় সান্নিধ্য থেকে, শান্তিময় গৃহপরিবেশ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হতে হয়; তাহলে শিশুর মন ভরে যায় গভীর বেদনায়। সেই বেদনা আরো উগ্র হয়ে ওঠে যদি এই পরিস্থিতিতে তার উপর অকারণ অত্যাচার উৎপীড়ন চালান হয়। শিশুমন তাতে একেবারেই ভেঙে পড়ে। ছুটির মধ্যে ছুটির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা একান্ত বিষময় হয়ে দেখা দেবে। কিশোর মনের এই বিষময় বেদনা যে কতখানি করুণ ও মর্মস্পর্শী হতে পারে তার একখানি অনবদ্য ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছুটি" নামে একটি ছোট গল্পে। সেই গল্পটি পাঠ করে আজ আমরা দেখব তরুণ বালক ফটিকের বন্দী জীবনের করুণ বেদনা কবির অমর লেখনী স্পর্শে কেমন সর্বজনীনরূপ লাভ করে সার্থক হয়েছে—এই বলিয়া শিক্ষক অত্রকার পাঠ ঘোষণা করিবেন।

(দ্রুত পঠনের পাঠদানকালে পাঠ ঘোষণাটি একটু বিস্তৃতভাবে করিয়া কাহিনীর মূল বক্তব্যটির প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ভাল হয়।)

উপস্থাপন—শিক্ষার সমগ্র গল্পটি শ্রেণীর সকল ছাত্রকে দ্রুত ও নীরবে পাঠ করিতে বলিলেন। পাঠের সময়ে গল্পের মূল বিষয়গুলি এবং কেন্দ্রীয় ভাবটি যাহাতে ছাত্রেরা ভালভাবে অনুসরণ করিতে পারে সেজন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রেরা বোর্ডে লিখিত বিষয় শীর্ষের ভিত্তিতে কাহিনীটি নীরবে দ্রুত পাঠ করিবে।

(১) ফটিকের খেলার প্রতি আগ্রহ
(২) মামার আগমন ও পরিস্থিতির পরিবর্তন
(৩) মামার বাড়ীতে ফটিকের মানসিক অস্বস্তি ও তাহার কারণ
(৪) কিশোরের বয়সের ধর্ম
(৫) বাড়ী ফিরিবার জন্য ফটিকের আগ্রহ
(৬) ফটিকের অসুস্থতা ও প্রলাপ
(৭) খালাসীদের জলমাপার অভিজ্ঞতা ও ফটিকের জীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া
(৮) 'ছুটি' কথার বিশেষ অর্থ

অভিযোজন—নীরব পাঠ শেষ হইলে ছাত্রেরা দ্রুত পঠনের দ্বারা কাহিনীর ভাব ও আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিল তাহা পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হইবে।

(১) গ্রাম্য বালক ফটিকের প্রকৃতি কেমন ছিল ?

(২) কিশোর বয়স্ক ফটিকের মনের ভাব কিরূপ ?

(৩) মামার বাড়ীতে ফটিক শান্তি পাইল না কেন ?

(৪) "—এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—" ফটিকের জীবনে একথার তাৎপর্য কি ?

(৫) 'ছুটি' কথাটি এখানে কি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ?

বাড়ীর কাজ—ছুটি গল্পটি পড়িয়া ছাত্রদের কেমন লাগিল, শিক্ষক সেই সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিতে বলিবেন।

রচনার পাঠ টীকা

তারিখ—	**বিষয়**—বাংলা রচনা
বিদ্যালয়—	**বিশেষ পাঠ**—বসন্তকাল
শ্রেণী—ষষ্ঠ	
বয়স—গড়	
ছাত্রসংখ্যা—	
সময়—৪০ মিনিট	
শিক্ষক—শ্রী	

উদ্দেশ্য—মুখ্য—বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা সুস্পষ্ট করিয়া সরল ভাষায় সুসংবদ্ধভাবে রচনা লিখিতে সহায়তা করা। গৌণ—ভাষা ব্যবহার, রচনা শক্তি, কল্পনা যুক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা।

আয়োজন—ছাত্রদের মন অন্তকার রচনার বিষয়বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ভূমিকা প্রসঙ্গে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হইবে।

১। কোকিল কাল, কাকও কাল। তবু আমরা কোকিলকে ভালবাসি কেন ?

(২) কোকিলের ডাক কোন সময় শুনিতে পাওয়া যায় ?

(৩) বৎসরে কয়টি ঋতু ? এ সময়টি কোন ঋতুর অন্তর্ভুক্ত ?

(৪) কি কি মাস লইয়া বসন্তকাল হয় ?

পাঠঘোষণা—আজ আমরা বসন্তঋতু সম্বন্ধে রচনা লিখিতে শিখিব এই বলিয়া শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ ঘোষণা করিবেন।

উপস্থাপন—ছাত্রদের নিকট অদ্যকার পাঠটি সহজ করিবার উদ্দেশ্যে এই পাঠ পরিচালনার সুবিধার্থ শিক্ষক বিষয়টিকে ছাত্রদের সহযোগিতায় প্রতিটি শীর্ষের আলোচনা করিবেন।

(ক) ভূমিকা—

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে
দিল তারে নববীথি কোকিলের কলগীতি
ভরি দিল বকুলের গন্ধে

এই কবিতায় কবি কোন্ ঋতুর আহ্বান করিয়াছেন ?

(২) কোন্ ঋতুর পর বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয় ?

(৩) এই দুই ঋতুর আবহাওয়ার পার্থক্য কিরূপ ?

(৪) এই ঋতুতে কোকিলের কলগীতি এবং বকুলের গন্ধের কথা বলা হইয়াছে কেন ?

(খ) প্রাকৃতিক শোভা—

(১) "পাতা ঝরানোর সময় হয়েছে শুরু—" কোন সময়ের কথা বলা হইয়াছে ?

(২) "জীর্ণ পাতা যাবার বেলা বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥"
একথা বলার তাৎপর্য কি ?

(৩) নূতন পাতায় আর ফুলে গাছ যখন ভরে ওঠে তখন প্রকৃতির শোভা কেমন হয় ?

(৪) বসন্তকালে কি কি ফুল ফোটে ?

(৫) এ সময়ে আকাশের শোভা কেমন হয় ?

(৬) কোন্ পাখীর ডাক এসময়ে বেশী শোনা যায় ?

(৭) এসময়ে বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় ?

(গ) মানব মনে বসন্তকালের প্রভাব—

(১) বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
করোনা বিড়ম্বিত তারে—
একথা বলার উদ্দেশ্য কি ?

(২) রসিক কবি ও গায়কের চিত্ত এসময়ে পুলকিত হয় কেন ?

(৩) বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হয় কেন ?

(৪) বসন্তকালে কোন্ কোন্ উৎসব হয় ?

(৫) ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে দোল পূর্ণিমা বলা হয় কেন ? তখন কি উৎসব হয় ?

(ঘ) সাংসারিক ক্ষেত্রে বসন্তকালের প্রভাব—

(১) এই সময় কোন্ কোন্ ফসল হয় ?

(২) চাষীদের অবস্থা এসময়ে কেমন থাকে ?

(৩) বর্ষাকালের বৃষ্টি বা শীতকালের হিম না থাকায় কাজকর্মের দিক দিয়া এসময়টি কেমন ?

(৪) যাতায়াতের দিক দিয়া এসময় কেমন ?

(ঙ) সুবিধা ও অসুবিধা—

(১) "কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি—"

—এখানে কি কি অর্থে বসন্ত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে ?

(২) বসন্তকালে কি কি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ?

(৩) সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় ?

(৪) 'বসন্তের এক হাতে হাসির ডালা

অন্যহাতে অশ্রুর মালা—" একথা বলা হয় কেন ?

অভিযোজন—

উল্লিখিত নির্দেশ অনুসারে খ) শীর্ষটি (প্রাকৃতিক শোভা) সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করিতে বলা হইবে। লিখিবার সময়ে শিক্ষকশ্রেণী কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রদের কার্য পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে ব্যক্তিগত ভাবে যথাসম্ভব তাহাদের সাহায্য করিবেন।

বাড়ীর কাজ—

সমগ্র রচনাটি বাড়ী হইতে সুন্দর করিয়া লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

(১) রচনাটিকে বিভিন্ন শীর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি শীর্ষ কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়া লিখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে একটি শীর্ষের ভাব অন্য শীর্ষে যেন সংক্রামিত না হইয়া যায়।

(২) রচনার ভাব যথাসম্ভব স্পষ্ট সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) বানান শুদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

Answer question No. 9 & Two each from Groups A & B

Group A

১। নিম্নের যে-কোনও একটি বিষয় সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখুন :—

(ক) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে মিশনারীদের অবদান।

(খ) বাংলা নাটকে গিরীশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

(গ) বাংলা উপন্যাসের বিকাশে শরৎচন্দ্রের প্রভাব।

(ঘ) কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী অথবা কবি জীবনানন্দ দাশ।

২। বাংলা ভাষাকে নব্য-ভারতীয়-আর্য (New-Indo-Aryan) ভাষা বলা হয় কেন ? আদি-ভারতীয়-আর্য্য (Old-Indo-Aryan) ভাষার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?

৩। অর্থ পরিবর্তন ও শব্দ গঠনের জন্য বাংলা ভাষায় 'শব্দদ্বিত্বে'-র ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। দৃষ্টান্ত সহযোগে যে-কোনও দুইটির ব্যাখ্যা করুন :—
শ্লেষ, ব্যাজস্তুতি, বর্ণবিপর্যয়, নামধাতু, খাটি বাংলা সন্ধি।

Group B

৫। সাহিত্য পাঠনে স্বাদনা (appreciation) ও বিচার-বিশ্লেষণ (critical appreciation) এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কবিতার অন্তর্ভুক্তি শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে যুক্তি-সংগত কি না আলোচনা করুন। কবিতা পড়াইবার জন্য শিক্ষকের কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজন আছে কি ?

৭। বাংলা বানানের সমস্যা কি ? এই সমস্যার সহিত শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান ভুলের কোন সম্পর্ক আছে কি ? বাংলা ভাষার শিক্ষক বানান ভুলের সমস্যার ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন কি ?

৮। শিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

Group C

৯। নিম্নের যে-কোনও একটি প্রসঙ্গ লইয়া একটি পাঠলেখ রচনা করুন :—

(ক) সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী একটি কবিতা বা কবিতাংশ (কবিতাটি বা কবিতাংশটি উদ্ধৃত করিতে হইবে)।

(খ) অষ্টম শ্রেণীতে ভাবসম্প্রসারণ :—

"রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে
আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে।" (রবীন্দ্রনাথ)

(গ) নবম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণের একটি বিষয় (এই শ্রেণীর উপযোগী)

(ঘ) দশম শ্রেণীতে একটি রচনা (রচনার বিষয় নিজেই নির্বাচন করুন)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Answer Q No 9 and two each from Groups A & B.

Group A

১। নিম্নের যে-কোন একটি বিষয় অবলম্বনে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখুন :—

(ক) বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের দান। (খ) মহাকবি মধুসূদন (গ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র (ঘ) ছোটগল্পে শরৎচন্দ্র।

২। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্পর্কে যথোচিত উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৩। বাংলা ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণগুলি দৃষ্টান্ত সহযোগে বর্ণনা করুন।

৪। দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন (যে-কোন দুইটি) ;—

(ক) সন্ধি ও সমাসের সংজ্ঞা ও পার্থক্য ; (খ) শব্দালংকার ও অর্থালংকারের সংজ্ঞা ও পার্থক্য ; (গ) বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ; (ঘ) বাংলা ধাতুরূপে ক্রিয়ার কাল বিভাগ , (ঙ) বাংলা কারক ও বিভক্তি।

Group B

৫। ভাষা শিক্ষায় পঠনের গুরুত্ব কতখানি এবং এই প্রসঙ্গে সরব পঠন ও নীরব পঠনের উপযোগীতা-ই বা কতদূর—একজন ভাষা-শিক্ষকরূপে আপনি প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করুন।

৬। মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় পাঠ্য-পুস্তকের ভূমিকা বিচার প্রসঙ্গে অন্যান্য পরিপূরক উপায় ও কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৭। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ পাঠের যথার্থ উপযোগিতা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করুন এবং সাহিত্য-বিষয়ক পাঠদানে ব্যাকরণের স্থান নির্দেশ করুন।

৮। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করার নীতিটি কতখানি বাস্তব এবং শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করুন।

Group C

১। নিম্নের যে-কোন একটি প্রসঙ্গের ভিত্তিতে পাঠটীকা রচনা করুন।

(ক) নবম অথবা দশম শ্রেণীর উপযোগী যে-কোন কবিতা বা কবিতাংশ (উদ্ধৃতিসহ)।

(খ) সপ্তম অথবা অষ্টম শ্রেণীর পঠনীয় ব্যাকরণাংশের উপযোগী যে-কোন বিষয়।

(গ) ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী যে-কোন রচনা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Answer five questions of which question No. 9 is compulsory ; of the rest, answer two questions from each of the Groups A & B.

Group A (ক বিভাগ)

১। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কি কি? বিশদভাবে আলোচনা করুন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

২। ভাষাশিক্ষায় ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা কি? ব্যাকরণ পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩। প্রদীপন (Teaching aids) কাহাকে বলে? ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য-পাঠে কি কি প্রদীপন ব্যবহার করা যায়? প্রদীপনের ফলপ্রসূ ব্যবহার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৪। পাঠটীকা কি? সার্থক পাঠদানের জন্য পাঠটীকার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিবৃত করুন।

Group B (খ বিভাগ)

৫। আধুনিক বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করুন ও উদাহরণ সহযোগে প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য আলোচনা করুন। বহুব্রীহি সমাস কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দিন।

৭। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি) :—

অলুক্ সমাস ; বিপ্রকর্ষ ; স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ ; তদ্ধিতপ্রত্যয় ; সাধুভাষা ও চলিত ভাষা ; সংযোজক ও বিয়োজক অব্যয় ; পুরাঘটিত বর্তমান ; অর্ধতৎসম শব্দ ; সমধাতুজ কর্ম।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান যুগগুলি কি কি ? প্রত্যেক যুগের সাহিত্য হইতে প্রয়োজনীয় উদাহরণ সহযোগে যুগলক্ষণগুলি নির্ণয় করুন।

Group C (গ বিভাগ)

১। যে কোন একটি বিষয়ে পাঠটীকা রচনা করুন।

(ক) রচনা—"বসন্তোৎসব"—সপ্তম শ্রেণীর জন্য।

(খ) যে কোন একটি গদ্যাংশ : নবম শ্রেণীর জন্য।

(গ) পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর—সপ্তম শ্রেণীর জন্য।

(ঘ) নিম্নলিখিত কবিতাটি :—নবম শ্রেণীর জন্য।

"অ-কেজোর গান"—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির ক্ষেতে
আমার এ মন মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥
এই রোদ সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌখেতে
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে যেতে।

আজ কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে
ঐ বাব্‌লাফুলে নাকছবি তার
গা'য় সাড়ী নীল অপরাজিতার
চ'লেছি সে অজানিতার
উদাস পরশ পেতে ॥

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Answer question no 9 and two each from Group A and B

Group A

১। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের সময়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কতখানি? বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় ঐ গুরুত্বের দিকে কিভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে?

২। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা গদ্য পড়াইবার প্রধান উদ্দেশ্য কি? আপনি কিভাবে এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিবেন দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন।

৩। বাংলা ভাষার ধ্বনি বিজ্ঞান (Phonetics) সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। শিক্ষকের পক্ষে ধ্বনি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৪। বাংলা ভাষায় রচনা ভালোভাবে শিখাইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

Group B

৫। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। 'পয়ারের ভিত্তিতেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ গড়িয়াছিলেন'—পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইয়া ইহা প্রমাণ করুন।

৭। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):

অনুসর্গ, উপসর্গ, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ, সমধাতুজ কর্ম, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার, বর্ণ বিপর্যয়, অসমীভবন।

৮। বাংলা গদ্যের বিকাশে—খ্রীষ্টান মিশনারীদের দান সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

অথবা

—নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে যে কোন চারিখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন।

(ক) বীরাঙ্গনা কাব্য। (খ) পলাশীর যুদ্ধ। (গ) কৃষ্ণকান্তের উইল। (ঘ) নারীর মূল্য। (ঙ) গড্ডালিকা। (চ) স্বর্ণলতা। (ছ) ঘরে বাইরে।

Group C

৯। যে কোন একটি বিষয়ে পাঠটীকা রচনা করুন:

(ক) রচনা—সংবাদপত্র—সপ্তম শ্রেণীর জন্য।

(খ) বহুব্রীহি সমাস—অষ্টম শ্রেণীর জন্য।

(গ) কোন একটি বিখ্যাত গল্পের দ্রুত পঠন—নবম শ্রেণীর জন্য

(ঘ) নিম্নলিখিত কবিতাংশটি—দশম শ্রেণীর জন্য।

চাষার বেগার—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—

রাজার পাইক বেগার ধরেছে
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ ছিল আজ,
পরের কাজে কাটবে সারাদিন
রইল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে
খাটছে সবে দিনে রেতে
শেষ 'জো'য়েতে রুইব ব'লে
বেরিয়ে ছিলাম আজ—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ির কাজ।

* * * *

জীর্ণ চালে হলনা আর দেওয়া
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিলল না কি পল্লীখানি খুঁজি ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি।
যেতেই হবে রাজার বাড়ী।
স্বর্ণ চূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হ'ল বুঝি।
যাচ্ছি চল চক্ষু ও কান বুঁজি।

———